অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দুই ভারতবর্ষ

এক ভারত এগিয়ে চলেছে। শিল্পে-বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে-প্রযুক্তিতে, সাহিত্যে-সংস্কৃতিতে, ক্রীড়ায়-সৌন্দর্যচর্চায় ক্রমশ তার জয়ের আসন আন্তর্জাতিক দরবারে। আরেক ভারত এখনও অন্ধকারে—অশিক্ষার, দারিদ্র্যের, বঞ্চনার, কুসংস্কারের। এই দুই ভারতের টানাপোড়েনের এক জীবন্ত কাহিনী 'দুই ভারতবর্ষ'।

•

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে চাঁদের অন্য পিঠের মতোই অন্ধকারে-থাকা সেই ভারতবর্ষের এক গ্রামীণ পটভূমিকায়, যেখানে আধুনিক সভ্যতার সবটুকু আলো পৌঁছয়নি এখনও। যেখানে আজও দারিদ্র্য আর বুভুক্ষা, অশিক্ষা আর কুসংস্কার, অসাম্য আর শোষণবঞ্চনা। অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যেখানে মিশে আছে বহু অলৌকিক ধ্যানধারণা, জনশ্রুতি আর আতঙ্ক।

তেমনই এক গ্রামে কীভাবে গিয়ে পড়ল এক তরুণ ডাক্তার, কীভাবে তার চোখের সামনে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হল নানান রহস্যকুয়াশা আর বুভুক্ষা-রিরংসায় ঢাকা গ্রামটির প্রকৃত চেহারাটা, কীভাবে তার জীবনে এল স্বপ্নের পৃথিবীর বাসিন্দা এক তরুণী, কীভাবে সে আবিষ্কার করল ভালোবাসার সেই আশ্চর্য চেহারাটা যা সর্বরোগহর এবং অপ্রত্যাশিত উপঢৌকনময়—তাই নিয়েই এই প্রাণবন্ত উপন্যাস।

প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল

আনন্দ পেপারব্যাক
উ প ন্যা স

মূল্য ৪০·০০

আ ন ন্দ পে পা র ব্যা ক

দুই ভারতবর্ষ

জন্ম : ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ। ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার রাইনাদি গ্রামে। দেশভাগের পর ছিন্নমূল। যাযাবরের মতোই প্রায় কেটেছে যৌবন। কখনও নাবিক রূপে সারা পৃথিবী পর্যটন, কখনও ট্রাক-ক্লিনার। পরে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা। প্রধান শিক্ষকও ছিলেন একটি স্কুলে। আবারও ঠাঁই-বদল। কখনও কারখানার ম্যানেজার, কখনও প্রকাশন-সংস্থার উপদেষ্টা। শেষে সাংবাদিকতা।

প্রথম গল্প মফস্বল শহরের 'অবসর' পত্রিকায়। 'সমুদ্রমানুষ' লিখে পান মানিক-স্মৃতি-পুরস্কার। পরে শিশির পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার।

উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, অলৌকিক জলযান, মানুষের ঘরবাড়ি, আবাদ, নগ্ন ঈশ্বর, একটি জলের রেখা, ঈশ্বরের বাগান।

॥ এক ॥

আকালকে জুতে আনতে পারছি না।

আকাল বড় ভোগাচ্ছে।

বছর দশেক ধরে আকাল মাথার ঘিলুতে বার বার কামড় বসাচ্ছে। আকাল, ময়না, ছোটবংশী, লাটুবাবু। লাটুবাবুর লাট, দাশু করের লাট—দুই তরফে আকাল আর ছোটবংশী দিন গুজরান করে। আর আছে একজন সাধুবাবা। মসজিদের ইঁদারা পার হয়ে খালপাড়ে তার ঝুপড়ি। মালা তাবিচ গলায়। লম্বা জোববা গায়ে। কাঁচাপাকা দাড়ি। শিরিঙে মানুষ। মাথার পাগড়িখানাও তালিমারা। গরীব গুরবো মানুষের ভরসা। হেকিমি দানরি যার যেমন দরকার—সে জল পড়ে দেয়, বলতে গেলে সে তাগা তাবিজের কারবারি।

আসলে আকাল জাতে গরীব। আকাল বদন কামাল ছোটবংশীর জাত আলাদা লোকলজ্জার মেহেরবানীতে। জাত নিয়ে বড়াই গরীবের সয় না। গরীবের মানায়ও না। জাত নিয়ে বজ্জাতি বড় হারাম তা তারা বোঝে। গরীবের জাত ধুয়ে কী যে হয়!

যাই হোক আকালকে নিয়ে এবং মল্লারপুরের বাসিন্দাদের নিয়ে নানা গল্পে এই জাত বেজাতের প্রশ্ন তুলে তার কোনও হিল্লে করতে পারিনি। ধানের জমি পড়েই থাকল, ফসল তোলা হল না। শুধু রাতে জাগালদারি সার।

রাতের ডঙ্কা বাজে। রাতচরা পাখিরা উড়ে যায়।

শুধু এক প্রশ্ন ধান কে খায়?

পোকামাকড়ে খায় না মনুষ্যে খায়?

যেমন একবার ছোটবংশী গল্পে হাজির—আঘুনের শীতে বড় কাবু ছোটবংশী। সকাল থেকে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। দু-দিন ঝড় বৃষ্টি গেছে। আকাশ মেঘলা। শীত না পড়তেই এই হাল।

ছোটবংশী যাচ্ছে জাগালদারি করতে। নিশিথে হিম হয়ে থাকে মাঠ। সে একখানা খুট গায়ে দিয়ে কেঁথা গায়ে দিয়ে জমি পাহারা দেয়। ফসলের জমি। ধানের মাঠ আঘুন মাসে সোনালীবরন

ধরে। জোছ্না উঠলে সোনালী গুখখুরের যেন এক তাজ্জব করা পিঠ। জোছ্না পিছলে যেতে সময় লাগে না। সুমার মাঠ ছোটবংশীর চোখে চলন্ত এক মহাকায় গুখখুরের পৃষ্ঠদেশ মনে হয়। গোটা মাঠটাই সচল হয়ে ওঠে। সোনালি সমুদ্র ভেসে ভেসে আকাশের হে-পাড়ে নিরন্তর অদৃশ্য। অন্তরালে তিনি এক দেবী হয়ে যান।

জোছ্নায় হিমের কুয়াশায় দেবীর আবির্ভাবও হয়। তিনি কোন কিসিমের দেবী সে জানে না। দেবী দিগম্বরী হয়ে কুয়াশায় ভেসে যেতে থাকলে তার বড় লজ্জা হয়। সে তখন চোখ বুজে থাকে। দেবীর লীলা খেলা বোঝা ভার।

মাঠের দেবী তিনি হতে পারেন, নাও পারেন। তবে সে ভাবে, তাঁর মর্জিতে সব হয়। পিচাশিতলা থেকে তিনি হয়ত নেমে এসেছেন।

তিনি অধরা। তাঁর পিছু ধাওয়া করতে নেই। পরি হুরি যিনিই হোন সে পাতায় ছাওয়া ডেরার মধ্যে কেঁথা গায়ে দিয়ে বসে থাকে। ডেঁড়িকুপি জ্বলে ভিতরে। শীতে কাবু হলে বিড়ি ফোঁকে। আর মাঝে মাঝে ডংকা বাজায়। রাতচরা পাখিরা ডংকা বাজালে উড়ে যায়। পোকামাকড় ঝিম মেরে থাকে। ইঁদুর বাদুড় আতঙ্কে পালায়।

বংশী সবই জানে। দেবীর কথাও।

তবে সে পাঁচ কান করে না।

পাঁচ কান না করলে কি হবে!

দেবীর এই অলৌকিক ভ্রমণ জানাজানি হতে বাকি থাকে না। দেবীর আবির্ভাব হলেই ঘোর সঙ্কট বোঝে। তিনি মধ্য রাতে জোছ্নায় ঘুরে বেড়ান। জাগালদার হেমন্ত, বদন কামালও দেখেছে। রোজ দেখা যায় না। মধ্য রাতে জেগে বসে থাকা সার। কখন তাঁর আবির্ভাব হবে কেউ জানে না। দেবীর মর্জি। জোছ্নায় সারা মাঠ বড় নিঃসঙ্গ।

দূরে অদূরে জাগালদার বসে থাকে ঘাপটি মেরে।

চোর ছ্যাঁচোরের উপদ্রব, পোকামাকড়ের উপদ্রব—কত উপদ্রব বাঁচিয়ে লাটে ফসল তুলতে হয়। যারা রাত জাগে তারাই শুধু জানে।

এই আকাল আর ছোটবংশীকে নিয়ে লেখকেরও মেলা হ্যাপা।

আকাল কে?

গরীব মানুষ। বামুন কায়েত জেলে জোলা বলে কোনও কথা নেই। সে গরীব। তার বউ ময়না বছর বিয়োনি। খালের ধারে মাটির ঘর, খড় বিচুলিতে ছাওয়া। লাটুবাবুর আমবাগানের এক কোনায় একটা গরু সম্বল করে জুতমতো খেপলা জালে মাছ ধরে। ফাঁক বুঝে চুরিচামারিও করে।

এই দেবীকে নিয়েও লেখকের কম হ্যাপা নয়। তিনি দেবী, না ভূত প্রেত পিশাচ কিংবা তিনি কোন দেবী—যিনি মধ্যরাতে হেমন্তের মাঠে বিচরণ করেন! দেবী ভৈরবী না তিনি ধূমাবতী।

নানা রূপে তিনি চরাচরে ভজনা পান।

জোছনায় নিঃসঙ্গ মাঠে এমন কী মায়া সৃষ্টি হয় তিনি বুঝতে পারেন না। জাগালদার ছোটবংশীর কি দায় দেবী দেখার? বদন কিংবা কামালেরই বা আতঙ্ক কেন এত। না দেখলে পীরের থানে মোমবাতি জ্বালবে কেন।

মাঠে নামার আগে পাঁচ পয়সার মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে মাঠে নামে। জিন পরি কত কিছু থাকতে পারে—গ্রামের প্রান্তভাগে কবরখানা—বড় বড় শিরিষ গাছ আর বাঁশের জঙ্গল ছাড়া আছে কিছু শেয়াল খটাসের উপদ্রব। অদূরেই দ্বাদশ বৃক্ষের পিচাশিতলা।

কোনও সালে জিন পরি, নারী হয়ে ঘুরে বেড়ান মাঠে। কুয়াশায় ঢাকা থাকে শরীর। হালকা বাদামি কুয়াশা বড় কুহক সৃষ্টি করে। তারা দেখতে পায় তেনার আহামরি বিচরণ। আতঙ্কে কেঁথার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করার চেষ্টা—কিন্তু পারে না। পিলে হলদে হয়ে যায়। পেটে কামড় দেয়। কেঁথা সরিয়ে ফের উঁকি দেবার সাহস থাকে না।

তবু মনুষ্য তারা। খিধা তেষ্টা নিবারণে জাগালদারের কাজটি করতেই হয়। তারা বিশ্বাসীজন, যে যে-লাটের।

সেই জিন পরি কুহক সৃষ্টি করে সরে পড়লেই, বদন লাফিয়ে উঠে বসে। দূরে শস্যক্ষেত্র। টিনের ক্যানেস্তারা বাঁশে ঝোলানো। লম্বা বাঁশ। আগায় ঝুলে থাকে ক্যানেস্তারাটি। মধ্যিখানে লাঠি সম্বল। লাঠির ডগায় সুতলি বাঁধা। নড়াচড়া করলেই ডংকা বাজে। সারা মাঠে কোলাহল সৃষ্টি হয়।

ভয়ে তরাসে চিৎকার—

কে জাগে?

রাক্ষসের ভাই খোক্কস জাগে।

কে জাগে?

লাটুবাবুর জাগালদার ছোটবংশী জাগে।

ডর নাই। দেবীর লীলা খেলা দেখতে নাই। ঘাপটি মেরে পড়ে থাক। তেনার কাজ সারা হলেই চলে যাবেন। পুণ্যবান না হলে দেবীর দর্শন হয় না বোঝো। এসব কথা ছোটবংশী মনে মনে শুধু ভাবে। সে দেখতে না পেলেও বদন দেখেছে। কোনও সালে হেমন্তও দেখেছে।

এই দেখাদেখির শেষ নেই।

কোন সালে কবে কে দেখবে তাও অজানা।

তবে দেবীকে নিয়ে মাতামাতি আছে। ফিসফাস কথাও হয়। মাঠে এ-মাসে দেবী নেমেছেন এমন একখানা কথা চাউর হয়েও যায়। মানুষ বড় কাতর প্রকৃতির কাছে। তেনারই লীলা খেলা। অগ্রাহ্য করা যায় না। বড়ই অসময়। দেবীর কোপে পড়ে গেছে তারা মনে করে। তিনি মাঠে দেখা দিচ্ছেন। জমির ধান পোকামাকড়ে খাবে। শস্যহানি হবে, মড়ক দুর্ভিক্ষ অপমৃত্যুতে ছেয়ে যাবে দেশ।

ছোটবংশী তুই দেখেছিস ?

আজ্ঞে তা তো বলতে পারব না।

কে বলতে পারবে ?

তা তো জানি না।

তবে কথা চাউর হয় কী করে ?

কথা চাউর হয় আতঙ্কে বাবু। রাত বড় মোহ সৃষ্টি করে। জোছনায় ফক ফক করছে সারা মাঠ। শীতের উত্তুরে হাওয়া। কেঁথাখানা গায়ে দিয়ে বসে থাকি। ঝিমুনি বাড়ে। কি দেখতে কি দেখি বলি কি করে ?

হেমন্ত তুই ?

আজ্ঞে কেউ আছেন একজনা।

সে কে ?

সে তো সঠিক জানি না। মনে লয় ওলাওঠার দেবী। জোছনা হাওয়ায় পাক খায় বাবু। মনিষ্যি জাগে না। পোকামাকড় ছাড়া দোসরও নেই কেউ। দূরে দূরে রাক্ষসের ভাই খোক্ষস জেগে থাকে ঠিক, তবে রা করে না। ডংকা বাজালে, হাই মাই কাঁই। দূর থেকে বোঝাও যায় না, কার গলা। ছোটবংশীর না জিয়াদের। তখনই মনে লয়, দেবী অদৃশ্য। ধানের জমিতে তাঁর হাঁটাহাঁটি থাকে না। কোথায় যে বেমালুম অদৃশ্য হন তিনি বুঝি না। তবে কিছু একটা আছে

বাবু। স্বীকার না করলে মিছা কথা হবে।

কিছুটা কি বুঝিস না ?

এই হিম পড়ে থাকে না, কুয়াশায় আবছা হয়ে থাকে না, দেবী যে তিনি বুঝি কী করে ! তিনি তো কুয়াশায় ভেসে ভেসে চলে যান। তাঁর মতলব বোঝা ভার। রোজ তো দেখা যায় না। সেই কোন সাল থেকে জাগালদারি করি, হিসাব নাই, দেবীরে একবার চাক্ষুস ধানের জমি পার হয়ে হেঁটে যেতে দেখেছি বাবু।

বংশী যে বলে তিনি দেবী দিগম্বরী ! তুই কী বলিস।

তা তো বলতে পারব না। জোছনা দেবী হয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলে সাহস থাকে কারও ! ডর লাগে না ! সুমার মাঠে জনপ্রাণী নাই, জাগালদার আছে যে যার ডেরায়, ডেঁড়িকুপি জ্বলে জোনাকি হয়ে, তাও উড়ে যায় হাওয়ায়। সাহস থাকে কার, দেবীর অনুসরণ করি এমন দুর্জয় সাহস আমার নেই বাবু। এক সালে দেখেই হৃৎকম্প। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় হাত পা অবশ, তখন কিনা দেবী দিগম্বরীর উদয়। আমি আর অধিক কিছু জানি বলে মনে লয় না।

বদন কী বলে ?

দ্যাখেন কর্তারা আল্লার দরবারে আছি, জাগালদারি করে খাই, জিন পরির উপদ্রব থাকতেই পারে। নিশুতি রাতে তেনারা বিচরণ করতেই পারেন। তিনি নারীভাবে দুনিয়ায় বিচরণও করতে পারেন। তবে তাঁর গোঁসা হয় এমন কাজ করি না। নিজের ডেরায় বসে থাকি। তিনি হাঁটাহাঁটি করেন টের পাই। জমিতে মছ্ মছ্ আওয়াজ ওঠে। সবই তো আল্লার মেহেরবানীতে হয়। অগম্য বিষয়। ধোঁয়া হয়ে মিশে যায়। এক সালে তেনার প্রকোপে পড়ে ভিরমি গেছিলাম। জমিতে মছ্ মছ্ শব্দ হলে আর তাকাই না। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। অনাসৃষ্টি সইবে কেন বাবু।

কামালকে ডাকো ?

কামাল এল। লুঙ্গি পরে গায়ে খোট জড়িয়ে। গোদা পায়ে হেঁটে এসে লাটুবাবু আর দাশু করের সামনে ঝপাত করে বসে পড়ল।

কামাল তোর শরীর খারাপ !

জী না মিঞাসাব।

তবে হোৎকা মেরে বসে পড়লি কেন ? ওঠ !

দাশু কর জবরদস্ত মানুষ। ছ' ফুট শরীর, দাঁড়ালে গাছের মতো। ধুতি পরেন। লুঙ্গি পরেন না। কামিজ গায়ে দেন—গাল সাফসুতরো, কোঁকড়ানো চুলে বাহারও কম নয়। চোখ ভাটা ভাটা।

গায়ে একখানা দামি শাল। খুসবো শরীরে। লাটুবাবুর বৈঠকখানায় দেখলে মনে হবে একমাত্র ইমানদার মানুষ।

বদন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বলেন সাব।

তুই তো আমার লাটে জাগালদারি করিস?

আজ্ঞে সাব।

ক' সাল হল।

কুড়ি দু'কুড়ি হবে। হিসাব নাই সাব।

হুরি পরি চোখে পড়ে?

আজ্ঞে না।

বংশী মিছা কথা বলে?

আজ্ঞে না।

দেবী দিগম্বরী তবে গুজব?

গুজব কি গজব বলতে পারি না সাব। জোছনা। বড়ই চমচমে জোছনা নীল আশমান। বসুন্ধরা নিশুতি রাতে বাক্যহারা।

বংশী বলল, শুধু কীটপতঙ্গের শব্দ। সারা মাঠ জুড়ে সোনালি ধানের খেত। মা-লক্ষ্মী উজাড় করে দেছেন। তা তাঁর মাঠ, তাঁর ধান, তিনি মাথা ঠিক রাখেন কী করে। তাঁর বিচরণের ইচ্ছা হলে আসেন। ডেরায় যত রাত কাত হতে থাকে তত কেন যে মনে হয় মাঠে তিনি বিরাজমান।

লাটুবাবুর ভর্ৎসনা, ছোটবংশী তুই কি নেশাটেশা করছিস আজকাল। মা লক্ষ্মী দিগম্বরী হয় কবে? কোন শাস্ত্রে আছে বল! পেঁচা বাদুড় ওড়ে, তুই তরাসে মাথা ঠিক রাখতে পারিস না বুঝি। দেবী দিগম্বরী হলে মা লক্ষ্মী নির্ঘাত ভিরমি খেতেন। এ অন্য দেবী। শাস্ত্রমতে তিনি কোন দেবী দেখতে হয়। আসল কথা তোরা কেউ ঝেড়ে কাশছিস না। দেবীর কোপ থেকে আত্মরক্ষা দরকার।

ছোটবংশী ঝেড়ে কাশতেও পারে না। কুয়াশা ভেদ করে চোখ বেশি দূরেও যায় না। ধানের গাছগুলো কোমর সমান উঁচু। তার জমিতে ধান মাটিতে মিশে থাকে না। নাবাল জমির ধানও নয়—লম্বা গাছ জল নেমে গেলে যে মাটিতে হত্যে দেবে! দেবী যেন পুলকে জোছনায় নেচে নেচে বেড়ান। ধানের গন্ধ শোঁকেন। আর উঠে দাঁড়ালে পলকে অদৃশ্য হন।

এটা যে তার চোখের ভুল নয় কে বলবে!

ঝেড়ে কাশবে কি করে! দেবীর কথা ভাবলে তার গলা শুকিয়ে যায়।

সে বাধ্য হয়ে বলল, মনে যা লয় বিবেচনা করেন। আমার মাথায় আসছে না কিছু বাবু।

ইবারে কি তিনি আবির্ভূতা হয়েছেন ?

লাটুবাবু প্রশ্নটা করেই বেকুফ বনে গেলেন বোধ হয়। কেউ ঝেড়ে কাশছে না। কেউ স্বীকার করবে না। গুজব হোক গজব হোক দেবীর কোপে কে পড়তে চায় মিছা কথা বলে।

দাশু কর বলল, তবে মাঠে কিছু একটা আছে মনে হয় লাটুবাবু। আমারও যে মাঝে মাঝে কি হয়। শেয়ালতলির বাঁশবাগান পার হলেই গা গরম হয়ে যায়। রাতে পিশাচিতলায় পড়লে শরীরে কাঁটা দেয়। মাথা ঝিম ঝিম করে। গুজব বড় সাংঘাতিক চিজ। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করি। বার বার তারই কথা আওড়াই, "তুমি কি তাদের দেখো নাই যাদের গ্রন্থের এক অংশ দেওয়া হয়েছে ? তারা বিশ্বাস করে ভূত ও অপদেবতাদের, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বলে : এরা বেশি ঠিক পথে আছে যারা বিশ্বাসী তাদের চাইতে।" আমার কি মনে হয় জানেন সবটাই শয়তানের কম্ম।

লাটুবাবু লুঙ্গি না পরলে বাড়িতে আরাম পান না। তিনি খানিকটা লুঙ্গি হাঁটুর কাছাকাছি তুলে পা চুলকালেন। মাঠের সব জাগালদারদের ডাকা হয়েছে। জাগালে যারা যায় তাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসকে দাম দিতে হয়। কখন আবার বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে—ভাল না, নিশুতি মাঠে কে যায়—পো ধরলেই হল। মাঠে গেলে ঘাড় মটকে দিতে পারে—দেয়নি যে তাও না। বলাই কেরানীর জাগালদার পঞ্চা গাজীকে বিলের জলে চুবিয়ে মেরেছিল ! মাথাটা কাদায় পুঁতে পা দুটো ডাঙায় ফেলে রেখেছিল। খালে বিলে নিশুতিরাতে অপদেবতাদের এই এক শত্রুতা আছে মানুষের সঙ্গে। সবাই মিলে পো ধরলেই হল।

তখনই দাশু কর কেন যে বলল, যাই বলেন লাটুবাবু—ঈশ্বর আমার জন্য যথেষ্ট—কোনো উপাস্য নেই তিনি ভিন্ন, আমার নির্ভর তিনি। শয়তান আমার সঙ্গে পারে !

লাটুবাবুর চা এসে গেছে। দাশু করের হাতে এক কাপ চা তুলে দিয়ে বললেন, তবে নিশুতিরাতে পিশাচিতলার মাঠ পার হতে শরীর ফুলে ঢোল হয়ে যায় এই যা। যাই হোক শাস্ত্রমতে বিধান দরকার। চাঁদা তুলে দেবীর পূজাটা দিয়ে দেওয়া ভাল। বিদেহী আত্মা হলেও হতে পারে। কে তিনি আমরা কিছুই জানি না। পঞ্চা গাজীও দেখেছিল দেবী উলঙ্গ হয়ে মাঠে ঘুরে বেড়ান, মনে আছে দাশু ভাই !

ইলেকশানের বছর, মনে নেই।

দাশু কর বলল, দেবী বলেনি—ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ায় বলেছিল। শয়তানের পাল্লায় পড়ে গোরে গেছে।

চা-এ চুমুক দিয়ে লাটুবাবু বললেন, যাই হোক গরীব গুরবো মানুষের শরীর গরম রাখতে ঠাকুর দেবতাই সম্বল। কী বলেন দাশু ভাই?

খুদু কর্মকার সব শুনছে। অষ্টপ্রহর গাঁয়ে ছায়ার মতো ঘোরে লাটুবাবুর সঙ্গে। সকাল হলেই লুঙ্গি পরে খালের ধারে হাঁটা দেয়। মুখে ভেরেণ্ডা গাছের ডাল, দাঁতন করে। ফেনা হয় মুখে। কস জমে যায়। আর অহরহ থুতু ছিটায় আর হাঁটে। পেট মোটা পাছা মরা শরীর। লুঙ্গি বার বার হড়কে গেলেও পার পায় না। ফস করে ধরে ফেলে। তারপর পেটে গুঁজে দেয়। সারা রাস্তায় পাঁচ সাতবার এই একটা কাণ্ড ঘটায় লুঙ্গি হারামজাদা। ঠিক কব্জা করতে পারে না। লুঙ্গি হড়কে হাঁটুর নিচে নেমে গেলেও ছাড়ে না। লুঙ্গির সঙ্গে সারা জীবনের শত্রুতা। লুঙ্গিও তাকে ছাড়বে না, সেও লুঙ্গির বশ হয়ে থাকবে। গর্দান নেই বললেই চলে, পাঁচমুণ্ডির কুমোরবাড়ির হাঁড়ি-কুঁড়ির মতো ছিরিছাদ নেই, নেবা মানুষের ফোলা মুখ নিয়ে হাজির হয় লাটুবাবুর বাগানে। কলে মুখ ধুয়ে ঢুকে যায় বৈঠকখানায়। কেউ নেই, একা, তবু বসে থাকে। কখন নামবে লাটু। নামলেই এক কাপ চা পাবে।

সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী চুপ করে থাকায় লাটুবাবু মাথা ঝাঁকিয়ে কি ভাবল। তারপর বলল, খুদুদা দেবীর পূজা চাঁদা তুলে হোক।

খুদু খেপে গেল।

তোমার কি ভাই কিছু কমতি আছে। লোকে বলবে না লাটুবাবু চাঁদা ছাড়া কিছু বোঝে না। তোমার বাপের আমলে এমন অনাছ্য কথা উঠলে তাঁর মাথা কাটা যেত বোঝো! তিনি তো সব রেখে গেছেন। কী রাখেননি বল? ঈশানীর নামেও মেলা রেখে গেছেন। চাঁদা করে হচ্ছে হোক—তবে খরচের বহরটা তোমারই।

তা নামে বেনামে মেলা জমি লাটুবাবুর। বাড়ির কুকুর বিড়ালও বাদ নেই। ভাগচাষীদের কব্জা করে জমি বেহাত হতে দেননি। ধান পাট কলাই সরষে গোলা ভর্তি। আড়ত আছে। পঞ্চায়েত প্রধান। দেবীকে তুষ্ট করতে তিনি একাই একশ। তবে...

খুদু না বলে পারল না, ভাল দেখায় না। লোকে আড়ালে আবডালে তোমার নিন্দামন্দ করবে। লাগাও ঢাকের বাদ্য। বাজাও শঙ্খ। ঢিম কুড় কুড় বাদ্য বাজুক। তুমি না পার, তোমার পরিবারের

নামে পূজা হোক। দাশু কর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, ঠিক ঠিক। ধম্ম হল গে মানুষের ছাতার মাথা। আছে বলেই ছায়া, না থাকলে কোথায় পেতে ! আপনারা দেবী বলেন দেবতা বলেন তারা তো অষ্ট প্রহর ছাতার মাথা হয়ে বিরাজ করছে। তার তলায় আপনারা হাঁটাহাঁটি করেন। অবহেলা করতে নাই। এটা তো মুসলমানের ধম্ম নয়, নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ঢুকবে বের হবে !

ছাতার মাথা, দাশু করের বক্রোক্তি। সবাই তারা পার্টি করে। ধর্ম ব্যাপারটা মাথায় নিয়ে নাচানাচি কারও শোভন নয়। বক্রোক্তি হোক, সোজা সরল হোক কেউ গেরাহ্যি করে না। কিন্তু খুদুর ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল—তা দাশু ভাই দু-পক্ষেরই কথা হোক। কেউ ছত্রধারী কেউ ব্যাঙের ছাতা—দু-পক্ষই সমান। সাদা চোখে পেট আর...সম্বল। এতগুলি লোকের সামনে তো আর অশ্লীল কথা বলে লাটুকে দাশু করকে খাটো করতে পারে না। সে পেট আর পরেরটুকু মৌনব্রত অবলম্বন করে বুঝিয়ে দিল, মানুষের আসল ধর্মের রহস্য।

তাই বলে তো দেবীকে আর নাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া যায় না। পূজা অর্চনা শুরু হলে দেবী প্রসন্না হবেন। দেবীর কোপ থেকে গাঁখানা বেঁচে যাবে এটাই আসল কথা খুদুদা।

লাটুবাবু জাগালদারদের ডেকে বললেন, দেবীর পূজার ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে আমরা এর মধ্যে থাকছি না। তোমরা যে যা পার দেবে। তিনি হলেন অন্নপূর্ণা। তাঁর পূজা ষোড়শোপচারেই হবে। দেবীকে ভূত প্রেত ভাবলে গোঁসা করেন। তখন বিধবা পিসি সিঁড়ি ধরে কেশে দরজার ফাঁকে উঁকি দিল, এ-হেন সময়ে বৈঠকখানায় বাড়ির কেউ উঁকি দেয় না। সকালটা লাটুবাবু নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। বৈঠক হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঘড়ি দেখে বোঝলেন, গ্রাম সেবিকারা তালিকা নিয়ে হাজির হবে। সুলতানপুর, হাঁসখালি, সুখচর থেকে আসবে কিছু দালাল। নাড়ি কাটার জন্য অনুপ্রাণিত করে তারা কমিশন পায়। উত্তরের হাওয়া বইলেই মরশুম শুরু। চার সাল ধরে আকালের বউকে চেষ্টা করেও জব্দ করা যাচ্ছে না। বছর বিয়োনি। খেতে পায় না, আকাল যখন যা হাতের কাছে কাজ পায় করে। না পেলে চুরি চামারি করে। আকালকে বুঝিয়েও রাজি করানো যায়নি। ভগমান একটা খেমতাই তাকে দিয়েছেন, বিচার না করে ক্ষমতা জোর করে কেড়ে নিলেই হল ! ময়নার পেটে আবার বাচ্চা—সে তো এইটুকু সুখ দেখেই মরতে রাজি। ব্যাটারা বড়ও হয়ে যাচ্ছে। ফল পাকুড়, গাছের পাতা কচু কন্দু বনআলু সম্বল গরীবের।

নাড়ি কাটলে পরিবার দুবলা হয়ে যাবে। পরিবার কিছুতেই মাথা পাতছে না।

লাটু বলল, কিছু বলবে টুকি পিসি ?

কী আর বলব ! তোর আসকারাতে আকালের বউটার এত সাহস ! ওর মিস্টি কথায় গলে যাস তুই, এক মন ধান ভেনে দু কাঠাও চাল দিল না। বলে কি না, ধানের ভাঙুনি বেশি। সব খুদ কুঁড়া হয়ে যায়। ওকে তুই বাড়িছাড়া না করলে সর্বস্ব খাবে তোর।

হবে পিসি। তুমি এখন যাও। এতগুলি সন্তান নিয়ে যাবেটা কোথায়। আকাল চুরি চামারি করে, ওর মাথা ঠিক নেই। বলে দেব। অত খুদকুঁড়া সরালে তোমার গোলা ভর্তি হবে না বুঝি।

কন্যে এসে হাজির।

বাপি !

কিছু বলবে ?

দাশু কর বলল, আয় বেটি, কবে এলি ?

ও মা দাশু কাকা দেখছি।

লাটুবাবু কন্যার বিগলিত ভাব মনে মনে বেশি পছন্দ করছেন না। দাশুর কন্যে এভাবে বৈঠকখানায় আসতেই সাহস পেত না।

কি চাই, আমি যাচ্ছি ভিতরে।

কন্যেটি তার রূপবতী। কত সব খবর রাখে ! সে তার ঘরটি প্রিয় শিল্পীদের ছবি দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। মেয়েটি তার অভিসারিকার মতো হয়ে উঠতে চায়। বাড়ি থাকলে ঘরের বার বেশি হয় না। হলেও তার মোটরবাইকটির প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা। ফাঁক পেলেই ওটাতে চড়ে হাওয়া। লাল দোপাট্টা উড়লে সবাই বোঝে লাটুবাবুর মেয়ের মধ্যে শান্তিনিকেতনি ঢং ফুটে উঠছে।

অভিসারিকার মতো ওই রকম কোমলতনু মুখ সে চায়।

এক জায়গায় গোটা গোটা অক্ষরে লিখে রেখেছে, আমার চাই অজন্তার দেয়ালে আঁকা কোনও সখির লম্বা ভুরু।

তা চাইলেই তো পাওয়া যায় না। কোথায় অজন্তা আর তার দেয়ালে কোথায় সখির চিত্র লাটুবাবু কিছুই জানেন না। তবু মনের মধ্যে সুড়সুড়িও আছে। আধুনিক জনজীবনের মধ্যে সে ঘুরে বেড়াবে আর সব সময় মুখে ফুটে উঠবে শিল্পের সুষমা। তা একমাত্র কন্যের আবদার সহ্য না করেও উপায় নেই। কলেজ ছুটি হয়ে গেলে বাড়ি আসে ঠিক, তবে নোংরা, সব নোংরা তার কাছে। এত গরীব গুরবো মানুষের মধ্যে হাল ফ্যাশানের বাড়িটার প্রতি, তার কম উষ্মা

নেই যেন। তার ঘরের দেয়ালে এক জায়গায় কেন যে লিখে রেখেছে—মানুষের শরীর প্রতারণা করে। কারণ সত্তা এবং বাইরের রূপ কখনও একসঙ্গে উপস্থিত হয় না। আর এই কারণেই মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মধ্যে এত ভুল বোঝাবুঝি হয়।

শরীর নিয়ে কন্যাটি নানা প্রতারণার শিকার বুঝতে কষ্ট হয় না লাটুবাবুর। সুন্দরী কন্যার আবদারে নাকাল। পড়াশোনা কী করে তাও তিনি ভাল বোঝেন না। ছেলের মতো মানুষ করতে গিয়ে বেশ বিপাকে পড়ে গেছেন। তার একটাই কথা, আচ্ছা দেখছি।

বাপি !

বড় সোহাগের গলা। বড় আদুরে গলা। লাটুবাবু ভজে গেলেন।

বলো। বলে ফেলো।

জানো আমার মনটা আবার খারাপ হয়ে গেছে। কিছু ভাল লাগছে না।

কলেজ তো খোলেনি মা। কী করে পাঠাই ?

দ্যাখো না আমার গালের নিচে লালচে লোম। ওগুলি থাকবে কেন ? মাথার চুল লালচে হয়ে যাচ্ছে। আমার একদম কিছু ভাল লাগছে না। এই চিঠিটা পোস্ট করে দিও কেমন।

ইনল্যান্ড লেটারে চিঠি। কোনো পাক্ষিক কাগজের নামে।

লিখেছি আমার বয়স একুশ। থুতনি গলার কাছে লোম গজিয়েছে। এ বয়সে ব্লিচিং বা ওয়াক্সিং করা যায় কি ! চুল লাল হয়ে যাচ্ছে, কী করব ?

ব্লিচিং বা ওয়াক্সিং কিছুই বোঝেন না লাটুবাবু। লোমনাশক ক্রিমটিম হবে। এ নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি না করাই শ্রেয়। মন খারাপ হলে এমনিতেই সহজে ভাল হতে চায় না। চিঠিটি গাঁয়ের ডাকবাক্সে ফেললে জায়গামতো পৌঁছাতে দেরি হবে। তার মন ভাল নেই বলে বোধ হয় বের হতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। নিমতলার ডাকবাক্সে বাপিকে দিয়ে ফেলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত। চিঠিটি তার কাছে গচ্ছিত রাখার এটাই কারণ। মোটরবাইকে চরকিবাজি করতে হয়। সকালটায় হাতে সময় থাকে ভেবেই জাগালদারদের ডাকা। খুদুদাই রাতে মনে করিয়ে দিয়েছে, লাটু দেবী নিয়ে ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলো। হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবু এবং গ্রামসেবিকারা আসবেন। রেকর্ড জন্মনিয়ন্ত্রণের বিষয়টা সেরে ফেলা দরকার। কাজ কতটা এগোল দেখা দরকার।

লাটুবাবু কিঞ্চিৎ ভ্রূকুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন।

এখানে বলা বোধ হয় শোভন হবে না বলেই চুপ মেরে গেলেন।

এই তো সেদিন তার ঘরে ঢুকে কী আহ্লাদ।

জানো বাপি আমার না শাড়ি পরতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ইচ্ছে যখন করছে পরে ফেল।

পরে ফেললে ইচ্ছেটা নষ্ট হয়ে যাবে না!

তা হোক না। মানুষের ইচ্ছে থেকেই সব কিছু হয়।

তুমি কিছু বোঝো না বাপি। ইচ্ছে আছে বলেই আমার সব কিছু ভাল লাগছে। ভাল লাগাটা মরতে দিতে পারি না।

লাটুবাবু বোঝেন আহ্লাদে মাথা খারাপ। তার আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

এখন মনে করিয়ে দিলে হত, তোমার শাড়ি পরার কী হল! ইচ্ছে কি আছে না মরে গেছে। মরে গেছেই ধরে নিলেন। নতুবা মন খারাপ হবার কথা না। লোমনাশকের ব্যবহার বুঝে ফেলেছে অথচ শাড়ি পরার ইচ্ছেটা হজম হয়ে গেছে।

ঠিক আছে যাবার সময় তোমার চিঠি পোস্ট করে দেব। এখন রেখে দাও। বের হবার মুখে মনে করিয়ে দিও।

আমার কী হবে বাপি।

কিচ্ছু হবে না। এখন যাও তো। লাটুবাবু বিরক্ত বোধ করছেন। বাইরের লোকের সামনে এটা ঈশানীর শুধু হ্যাংলামিই নয়। আমার সব হয়ে গেছে জানান দেওয়া। নারীর এই রঙ্গ তাকে কিছুটা ভবকাতুরে করে রাখল। দিনকাল কী হয়ে গেল!

ওরা এসে গেছে। আসতে বলি লাটু।

কোনোরকমে দায়সারা কাজ শেষ হলেই বাঁচেন। মেয়ের মন খারাপ হওয়া মানে বিতিকিচ্ছা ব্যাপার। খাবে না, শুয়ে থাকবে। শুয়ে না থাকলে বাথরুমে ঢুকবে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজবে। মুখের রঙ পাল্টাবে। ভুরু আঁকবে। পোকামাকড়ের উৎপাত শরীরে। টোকা মেরে ফেলে দেবে। না হয় হাই তুলবে। চুলে শরীরে নানা পারফিউমের ছড়াছড়ি। যাত্রাদলের সখির মতো ঘাঘরা পরে পায়ে রুপোর নূপুর বাজিয়ে বারান্দায় ঘোরাফেরা করবে। মাথায় সুবর্ণ চেলি, রাজদুহিতারা কোথায় লাগে! চোখে কাজল না আইল্যাস ছাইপাস কি মেখে বেড়ায় তাও তিনি জানেন না। পরিবার সারাদিন পানের বাটার সামনে বসে থাকে। চাকর-বাকরদের ফাই ফরমাস ছাড়াও কন্যেটি যে লাগামছাড়া হয়ে যাচ্ছে তার হুঁস নেই।

থেতলে বসে থাকতে পছন্দ করে। উঠতে চায় না। একটা জলহস্তী।

এত সব বিভ্রাটের মধ্যেও তিনি পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। উপরের নির্দেশ ছাড়া কোনো কাজ করেন না। পরিবার, পিসি, কন্যে এবং সংসারে উটকো আত্মীয়রা যদি তা বোঝে ! সংসারের হাজার ঝামেলা এড়িয়ে জনগণের সেবা করে যাচ্ছেন। কিছুটা গম্ভীর মুখে সবাইকে বৈঠকখানা খালি করে দিতে বললেন। চ্যাংড়া ডাক্তার সব এসে হাজির হয় হেলথ সেন্টারে। দু চার মাস থাকে, তারপর পালায়। তবে দু একজন চালুনির ফুটো দিয়ে যে ফসকে যায় না তাও নয়। বছর তিনেক থাকে। সময় কাবার হলেই কেটে পড়ে।

কে একজন চ্যাংড়া ডাক্তার আবার এল কে জানে ! তারই আসার কথা। নতুন ডাক্তার। এখনও দেখা সাক্ষাত হয়নি। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নাড়ি কাটতে ক'জন রাজি, তালিকাটি সঙ্গে আনতে বলেছেন। নিজেও ঘুরে ঘুরে বুঝিয়েছেন, ঝাড়া হাত পা হয়ে যাও, দেখছ না—জমি জায়গা সব দখল হয়ে যাচ্ছে। মাথা গজাচ্ছে, জমি তো নতুন করে গজায় না। মানুষের জঙ্গল সাফসুতরো না করলে যে সবাই মরবে।

বৈঠকখানায় এখন খুদু কর্মকার, দাশু কর আর লাটুবাবু। ছোকরা ডাক্তারটি ঢোকার মুখে বলল, 'মে আই কামিন সার।

আরে আসুন আসুন।

দাশু কর লাটুবাবু দু'জনেই উঠে গেলেন। খাতির যত্ন না করলে উড়ে যেতে পারে। হেলথ সেন্টারের ছাদ ফুটো, জল চোঁয়ায়। দরজা জানালা হাপিজ। কোথায় উঠেছেন খবরটা কানে এসেছে। বলাই কেরানী তার ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে উপকারই করেছে তাঁর। কোথায় থাকবে খাবে এটাও কম বড় সমস্যা নয়। হেলথ সেন্টারের সবই তো গেছে। কুকুর শেয়াল বাসেরও অযোগ্য।

কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো।

আজ্ঞে না সার।

ওদের ডাকুন।

একে একে গ্রাম সেবিকারা ঢুকে গেল। তালিকা হাতে। তালিকা মিলিয়ে দেখলেন সুলতানপুর মহল্লার নামই নেই। তালিকাটি দাশু করের হাতে দিয়ে বললেন, না কোনো আশা নেই। নাড়ি কাটলেই হাতে হাতে একেবারে নগদ দুশো টাকা। কী হল ? দাশু ভাই আপনার গাঁয়ে কি কোনো কাজ হয়নি !

লাটুবাবুর মুখ ব্যাজার।

ঠিক আছে আপনারা যান কাগজপত্র থাকুক। পরে পাঠিয়ে দেব।

ওরা চলে গেলে, দাশু কর হেসে ফেলল। লাটুবাবু, ইমানদার মানুষ আপনি। সুলতানপুরের কিছু আলগা নাম ঢুকিয়ে দিলে হয় না!

ডাক্তার কি মানবে?

আরে টাকা, পার হেড দুশো টাকা। ভাগ করে নিলেই চলবে। আপনাদের ল্যাহ্য ধর্মে একটা কথা আছে না, ভাগের মা গঙ্গা পায় না—মিছা কথা। ভাগের কড়ি পেলে অলেহ্য লেহ্য হয়। দুনিয়া উড়ে না গেলে তো কেয়ামতের দিন আসবে না। কবে উড়বে, কবে কেয়ামতের দিন আসবে তার তরাসে নসিব খারাপ করতে আমি রাজি না।

তা হলে তাই কথা থাকল। শ'খানেক আলগা নাম ঢুকিয়ে দিন। সই করব, তবে চোখ খুলে নয়। চোখ বুজে। আনধা লোকের দোষ থাকে না।

আর তখনই হল্লা বাইরে।

ঈশানী খড়গাদার নিচ থেকে গোটা পাঁচেক কুকুরের বাচ্চা নিয়ে ছুটছে। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে। কামড়ে না দেয়। কুকুরটার যোনি থেকে লালা গড়াচ্ছে। কুঁই কুঁই করছে বাচ্চাগুলি। ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে আছে। ঈশানী কেবল বলছে, অ নতুন ডাক্তার পালাচ্ছ কেন। ধর। এই সামনে। রোদ চাই। কুকুরটাকে ওষুধ দাও। নতুন ডাক্তার, তোমার কি মায়া হয় না! কুকুর কি মানুষ না?

কুকুরছানাগুলির চোখ ফোটেনি। ঈশানী ম্যাকসির কোচরে ছানাগুলি রেখেছে। ম্যাকসি হাঁটুর উপর। দুখানি লাবণ্যময়ী পা উরু পর্যন্ত খালি। সেদিকে তাকিয়ে নতুন ডাক্তার বড় অস্বস্তিতে পড়ে গেল। এই তবে সেই সূর্যতনয়া। এত সুন্দর! সে চোখ ফেরাতে পারছে না। এ-ভাবে আধা উলঙ্গ নারীর সামনে সে কখনও দাঁড়ায়নি। তাকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করছে না। তার দিকে ছুটে আসছে। সে সত্যি পালাতে পারলে বাঁচে।

॥ দুই ॥

সুলতানপুর গ্রামটা পাকা সড়ক থেকে ক্রোশখানেক কাঁচা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে গাঁয়ে ঢুকতে হয়। নতুন ডাক্তার এখানে আসার পরই সাইকেলে চক্কর মেরে তার এলাকা ঘুরে দেখেছে। সামনে শুধু উধাও করা মাঠ। সুলতানপুর পার হলে মল্লারপুর পিচাশিতলা, হাসখালি, সুখচর। কাঁচা সড়কের দু-পাশে হাঁস মুরগি গরু ভেড়া, চাষের বিছন, গরুর গামলা আর মাটির ঘর সব। চাষাভুষো মানুষ, অপুষ্টি সার। মাঝে মাঝে পাকাবাড়ি বাগান পুকুর আর মোপেট গাড়ি।

পাকাবাড়িগুলি হালে তৈরি। টাকা যে উড়ছে বোঝা যায়।

নরহরি পণ্ডিত বলেছিল, দেখছেন গাঁয়ের চেহারা কেমন পাল্টে যাচ্ছে। আরও পাল্টাবে। পার্টির দয়ায় সব হচ্ছে।

নতুন ডাক্তার গাঁয়ে আসার আগেই খবর পেয়েছিল সব। সিনিয়র দাদারা বলেছে, চোখ বুজে তিনটে বছর। তারপর সদর না হয় মহকুমা হাসপাতালে।

লুঙ্গি পরে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে একজন পঞ্চায়েত সদস্য প্রথম দিনই প্রায় বলতে গেলে শাসিয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা থাকলে বলবেন। গাঁয়ে মানুষজন থাকে। আপনারা শরীরে যে হাওয়া খেয়ে বেড়ান—এই মাঠ, ফসলের খেত না থাকলে আসত কোত্থেকে। শহুরে লোকদের ওই এক দোষ, হেলা ফেলা করে। ঝোপ জঙ্গলেও ফুল ফোটে। পছন্দ হয় তো বলবেন। বেশ হবে, এখানে রেখে দেওয়া যাবে। পালাতে গেলে লেজুড়ে টান পড়বে।

নতুন ডাক্তার সবে পাশটাশ করে বের হয়েছে। প্রায় কোনো কাজই নেই হেলথ সেন্টারে। কেন যে সরকার এতগুলি টাকা মাসে মাসে গচ্চা দেয় সে বোঝে না। ঘণ্টা তিনেকের মতো সেন্টারে বসা। সর্দি কাশি আমাশয় ছাড়া জটিল রোগে রুরাল হাসপাতাল। সেন্টারে নার্স আছে একজন। ইন্ডোর পেশেন্ট নেই বলে তার কাজও নেই। মাসের শেষে এসে মাইনে নিয়ে যায়। ফার্মাসিস্ট বাবু হাঁসখালি থেকে আসেন। ওষুধ বলতে কিছু ভিটামিন ট্যাবলেট। সব রোগেই ভিটামিন ট্যাবলেট ধরিয়ে দেওয়া। আর আশ্চর্য সে দেখেছে ওতেই কাজ হয়ে যায়। কারমিনেটিভ মিকচার আর প্যারাসিটামল ট্যাবলেট সঙ্গে। সাদা বড়ি লাল জল—সর্বরোগহর দাওয়াই।

হপ্তাও পার হয়নি, নিমতলার গোষ্ঠ অধিকারী হাজির একদিন। বলাই কেরানী সঙ্গে নিয়ে এসেছিল।

নিমতলা জায়গাটা গঞ্জের মতো। সিনেমা হল নেই তবে ভিডিও পার্লার আছে। দাওয়াইখানা আছে। পাট চালের আড়ত আছে। মোড়ে মনোহারি দোকান, চায়ের দোকান সবই আছে। হপ্তায় দুদিন হাট বসে। দৈনিক বাজার বসে সকালে। গোষ্ঠ অধিকারী দাওয়াইখানার ডাক্তারের খোঁজে তার কাছে হাজির। বলাই কেরাণীর কাছে খবরটা পেয়েই ছুটে এসেছিল।

সিনিয়ার দাদাদের এক কথা।

যা বলবে, শুনবি।

একজন মুরুব্বি থাকলে ভাল হয়।

কোনো কনফ্লিকটে যাবি না সুধাময়।

সুধাময় গোষ্ঠ অধিকারীর বিগলিত ভাব দেখে মজে যায়নি। তবে দাদাদের পরামর্শের কথা তার মনে ছিল।

কোথায় যে কে কোন গর্তে লুকিয়ে আছে বোঝা মুশকিল। গ্রামের মানুষ সরল সহজ হয়, উদার হয় কস্মিনকালেও ভাবতে যাবি না। মাস্তান রাজ, পুলিশ আর পার্টি ছাড়া গাঁয়ে মানুষ থাকে না। কিছু আবাল মানুষ সব গাঁয়েই আছে। মাথা মোটা, গোঁয়ার এদের হাতে রাখার চেষ্টা করবি।

দ্বিতীয় আর একটি উপায় বাতলে দিয়েছিল।

সুধাময় তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সদরে সি এম ও সাবের ঘর থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচজন লোক এসে ছেঁকে ধরেছে। এই যে ডক্টর ভদ্র—

সে জানে সব। স্মিত হেসে টাকা বের করে রসিদ নিয়েছিল হাতে। এই রসিদটি অমূল্য। শিবের মাথায় বিল্বপত্রটি চাপালেই হল। তার সাত খুন মাপ। সে ইচ্ছা করলে, তিনদিন হাজিরা দিয়ে বাকি চারদিন ডুব মারতে পারে। মাসের পর মাস ডুব দিলেও ক্ষতি নেই। পেছনে তার মুরুব্বি পার্টি। আট ঘাট বেঁধেই সুধাময় কর্মস্থলে হাজির। কলকাতা থেকে ছ'সাত ঘণ্টা বাসে, তারপর গোঘাটে বাস বদল। নিমতলায় নেমে হেঁটে অথবা সাইকেলে। রিকসা পাওয়া যায়। গরুর গাড়িও। মোড়ে একজন বলেছিল, কিছু ভাববেন না সার। অটো চলল বলে। লাটুবাবু আর দাশু করের কত বাহার দেখবেন যেতে যেতে।

তা সে বাহার দেখেছিল। পাড়াগাঁর রাস্তাঘাট সত্যি ভদ্রস্থ

হয়েছে। কাঁচা সড়ক ঠিক—তবে জল জমে না। ছাই আর রাবিশ ফেলে বেশ চওড়া রাস্তা পিচাশিতলা পার হয়ে হাঁসখালির দিকে চলে গেছে। রাস্তার দু-ধারে সারি সারি ইউক্যালিপটাসের গাছ, ঘন জঙ্গল, ফাঁকে ফাঁকে গরীব মানুষের ঘরবাড়ি, পাতাকুড়ানিরা মরা ডালপাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। পিচাশিতলার অক্ষয় মণ্ডলের বাড়ি খুঁজে বার করা দরকার। রিকসায় বসে যতটা পারছিল পলকে দেখে নিচ্ছিল। ফার্মাসিস্টবাবু বললেই বেশি চেনে। অক্ষয় নামটাতে তেমন আর জোর নেই সে জানত। রিকসায়ালা অক্ষয় মণ্ডল বলায় গা করেনি। ফার্মাসিস্টবাবু বলতেই গা ঝাড়া দিয়ে বলেছিল, ফার্মাস্টিস্টবাবু কে হয় আপনার ?

কে হয় কী বলবে ? কেউ যে হয় না, আপাতত, এই আস্তানার কথাই তার জানা আছে। মনটা দমে গেছিল। বেলা পড়ে গেছে। সকালের বাস ধরেছে। একদিনের অন্তত রাত্রিবাস। চার্জ বুঝে পরদিন সকালে ফিরে যাবে ঠিক করেছিল। রুরাল হাসপাতাল থেকে তেমনই কথাবার্তা হয়ে আছে। অচেনা অজানা জায়গা। বড় নির্বান্ধব লাগছিল নিজেকে।

চার পাঁচ মাসে সব গা সওয়া হয়ে গেছে তার।

গোষ্ঠ অধিকারীর দাওয়াইখানায় সে বিকাল চারটায় ঢুকে যায়। উঠতে কোনোদিন বেশ রাত হয়। পশার জমে উঠছে। পাশাপাশি আরও দু তিনটে ওষুধের দোকান যে নেই তাও নয়। কোয়াক ডাক্তার অম্বিকাবাবুর খুবই পসার। সাইনবোর্ডে এম আর সি এস, পি সি ডি এ, এই ধরনের সব ডিগ্রির কথা উল্লেখ আছে। কেউ চ্যালেঞ্জ করে না। বিশ বাইশ বছরে মানুষটি এখন এলাকার ধন্বন্তরী।

দিনকাল তার কেমন এলোমেলো মনে হয়। যে যা করছে করতে দাও। ল্যাজে পাড়া পড়লেই ফোঁস করে উঠবে। ল্যাজে পাড়া না পড়লে কেউ টুঁ শব্দটি করবে না। সে এমনিতেই কিছুটা চাপা স্বভাবের মানুষ। অম্বিকা ডাক্তারের কিংবা ধীরেন ডাক্তারের সুখ্যাতি শুনলে সে হাসে। নিন্দা শুনলে হাসে না। এও তার মনে হয়, মানুষজন যাবেই বা কার কাছে। পাঁচ ক্রোশ দূরে রুরাল হাসপাতাল। শহর থানা হাইস্কুল কলেজ সব আছে। সেখানেই রুরাল হাসপাতালের ডাক্তারদের রমরমা পসার। তারা এখানে মরতে আসবে কেন !

ওঠার মুখেই সকালের ঘটনাটা তার মনে পড়ে গেল। তিনিই কি তবে নরহরি পণ্ডিতের ভাষায়, সূর্যতনয়া !

যাই হোক ডিসপেন্সারির বাইরে সে বের হয়ে দেখল, পটলা তার সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে রওনা হয়ে গেলেই গোষ্ঠ অধিকারী দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিতে বলবে। পটলার ছুটি। ঝাঁপ ফেলে না দিলেও ছুটি। বাবু তাকে রেখেছে, ডাক্তারবাবুর ফাই ফরমাস খাটার জন্য। সেই স্লিপে নাম লিখে রাখে। কে আগে, কে পরে পটলাই বলে দেবে। দশটাকা ভিজিটের দু টাকা নেয় গোষ্ঠ, আর এক টাকা নেয় পটলা। টাকাপয়সার হিসাব পটলাই রাখে। তবে ভিজিট দশ টাকা বলেই দিতে হবে তার কোনো কড়া আইন নেই। পুরো দশ টাকা ভিজিট কবে পেয়েছে তাও সে মনে করতে পারে না। আনুপাতিক হারে টাকাটা ভাগ হয়। যে যা দেয়।

আজ তার মোট ছাব্বিশ টাকা হয়েছে।

পাশ করা ডাক্তার। হেলথ সেন্টারের ডাক্তার—তার রুগীর ভিড় না থাকুক, স্লিপের কড়াকড়ি থাকা দরকার। এল, আর দেখিয়ে গেল, ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে গেল—কড়াকড়ি না থাকলে শ্রী দুর্গা মেডিক্যাল হলের ইজ্জত থাকে না। ডাক্তারের তো নয়ই। অধিকারী মশাই তা ভালই জানেন।

ঝাঁপ ফেলার সময় অসময় নাই। পেছনেই বাড়ি, পুত্র পরিবার নিয়ে বাড়িটায় কিছু গাছপালাও আছে। দুটো জার্সি গরু আছে। পটলা দিনের বেলায় গরুর জাবনা দেয়। ঘাস কেটে আনে। বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে আসে। খাঁটি গো দুগ্ধেরও ব্যবস্থা রাখায় অধিকারীর শরীরে বেশ মেদ জমেছে। গিন্নির শরীরেও।

সুধাময় বুঝল রাত একটু বেশিই হয়েছে। পাড়াগাঁয়ে রাত তাড়াতাড়ি বাড়ে। জনাইপুরের বাস ছেড়ে গেল। দুটো ট্রাক ভর্তি হচ্ছে পাটের গাটে। মানুষজনের ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। সাইকেলে ক্রোশখানেক পথ উধাও করা মাঠে পড়লে পলকে পিচাশিতলা। পিচাশিতলার শেষ প্রান্তে ডজনখানেক অতিকায় অশ্বত্থগাছের ভুতুড়ে অন্ধকারটা পার হতে পারলে সুধাময় লাটুবাবুর আমবাগান পেয়ে যায়। আমবাগান পার হয়ে রাস্তাটা বেনেপাড়ার ভিতরে ঢুকে গেছে।

পিচাশিতলার জঙ্গলটাই ভয়ের। গাছের নিচে হরেক রকমের যক্ষ রক্ষের বাস। কিম্ভূতকিমাকার দাঁত বের করা ডাকিনি যোগিনীর মন্দিরও আছে। গাছে গাছে তেল সিঁদুর মাখামাখি। জায়গাটা ভাল না এমনও শুনেছে। রাত বিরেতে পারতপক্ষে পিচাশিতলায় কেউ যায় না। পণ্ডিত মশাই বলেছেন, সহস্র কুমারী যোনির প্রকোপ আছে

জায়গাটায়। বেশি রাতে পিচাশিতলা দিয়ে না আসাই ভাল।

সাইকেলে চেপে বসলেই এই ভুতুড়ে জায়গাটা তাকে তাড়া করতে থাকে।

হেমন্তের ঠাণ্ডায় সে বেশ কাবু। কদিন খুব বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়া। মাথায় মাফলার পেঁচিয়ে নিয়েছে। পাড়াগাঁয়ে শীতের এত প্রকোপ সে জানত না। ঠাণ্ডায় যেন হিম হয়ে আছে সব কিছু। গাঁয়ে বিদ্যুতের আলো এসে যাওয়ায় রাস্তায় লোকজন বেশি রাতেও চলাফেরা করে সে জানে। কিন্তু বের হয়ে বুঝল, ঠাণ্ডায় যে যার ঘরে, নবীন কুণ্ডুর সারের দোকান বেশি রাতেও খোলা থাকে। পার্টির বাবুরা জমায়েত হন। পাশের বনমালী চা কাম রেস্টুরেন্ট। চা, সিগারেট কখন কি লাগবে বাবুদের সে জন্য জেগে থাকে দোকানী। আজ সবই বন্ধ। সকাল থেকেই ঠাণ্ডা। উত্তুরে হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডা যে এমন জাঁকিয়ে বসবে চুনকাম করা মোটা মাটির দেয়াল তোলা ঘরে বসে টেরই পায়নি সে।

একটা লোক নেই।

একটা কুকুরও নেই।

মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে গরীব মানুষের জন্যও বিদ্যুতের ব্যবস্থা রেখেছে সরকার। মিটার নেই। একটা ডুম জ্বলবে—এই আলোই যথেষ্ট। যে পারছে নিতে, নিয়েছে, যে পারেনি, নেয়নি। রাস্তার কিছুটা গেলেই গাঁয়ের শুরু। কিন্তু কোথাও আলো জ্বলছে না। লোডশেডিং নয়, কারণ লোডশেডিং হলে পুরো এলাকাটাই অন্ধকার হয়ে যায়। নিমতলায় ঝুপ করে তবে অন্ধকার নামত। আজকাল লোডশেডিং-এর প্রকোপও তেমন নেই। আসলে যে যার দরজা জানালা বন্ধ করে ঠাণ্ডা থেকে আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত। হাত পা অসাড় হয়ে আসছে। নাকে মুখে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা। মাফলার গলায় আলগা হয়ে যাচ্ছে।

মাথার উপরে আকাশ। আর বনজঙ্গলে সর সর শব্দ। ইউক্যালিপ্টাসের পাতা ঝরছিল। রাত তো খুব বেশি হয়নি। রাত আটটা না বাজতেই এমন নিঝুম পৃথিবীর হাড়কাঁপুনি ঠাণ্ডাতেও সে কেমন ঘাবড়ে যাচ্ছে। সামনেই পিচাশিতলা। নিরেট অন্ধকারে কিছু জোনাকি পোকার ওড়াউড়ি। হরিদ্রাভ পিচাশিনী এই বুঝি খুক খুক করে কেশে উঠল। আর নাকি সুরে যদি বলে, আমারে বাবা কেঁথা দিবি একটা। শরীর টাল হয়ে গেছে বাপ।

চারপাশে তাকালে কেমন গভীর নিশুতি রাত মনে হয়। গরুর

গাড়ির চলাচলও থাকে। গাড়ির নিচে লণ্ঠন জ্বলে। তাও নেই।

সে ডিসেকসান রুমে কলেজের প্রথম বছরটায় কম দিন কাটায়নি। শিরা উপশিরা থেকে মানুষের অস্থি মজ্জায় কী থাকে সে ভালই জানে। অথচ এখানে আসার পর পিচাশিতলা জায়গাটা রোজই রাতের অন্ধকারে কিছুটা কাবু করে রাখে। আজ একটু যেন বেশি পরিমাণে।

পিচাশিতলায় ঢোকার আগে সুধাময় সাইকেল থামিয়ে মাফলার ভাল করে মাথায় জড়িয়ে নিল। গায়ে ফুল হাতা সোয়েটার, নিচে তুলোর ফুলহাতা গেঞ্জি। সাইকেল চালালে শরীর এমনিতেই উষ্ণ হয়ে ওঠে। আজ তাও হচ্ছে না।

আসলে নরহরি পণ্ডিতের কী যে দরকার ছিল এত কথা বলার। জায়গাটার মহিমা কত বোঝানোর দায় কে তাকে দিয়েছে সুধাময় তাও জানে না।

বলার কি দরকার ছিল, দ্বাদশ বৃক্ষই আমাদের রক্ষাকারী।

দ্বাদশ বৃক্ষ মানে বারোটি দু আড়াইশ বছরের অশ্বথ গাছ।

প্রায় নবাব আলিবর্দির আমলে কোনও এক তান্ত্রিক আর তার ভৈরবীর উদয় হয়েছিল সে খবরও দিয়েছে।

তান্ত্রিকের নাম বাঁকাবিহারী, ভৈরবীর নাম শাকাহারী। এঁরা দুজন ভোজপুরী ভাষায় কথা বলতেন। পাটনা মুঙ্গের হয়ে সর্বতীর্থ সার মনে করে এখানে দ্বাদশ বৃক্ষ রোপণ করেন। তখন এই অঞ্চলে লোকালয় বলতে মল্লারপুর। মল্লারপুরের বাবুরা দেখলেন সেবারেই ওলাওঠার মহামারীতে গা উজাড় হয়ে যাচ্ছে। লোকজন পালাচ্ছে।

বাঁকাবিহারী মন্ত্রপূত তেলসিঁদুর দিলেন বাবুদের হাতে। সর্বজয়ী তিলক এঁকে দিলেই, মহামারী ছুঁতে পারবে না। তারপর কেমন বিস্ফারিত চোখে চায়ের কাপটি পাশে রেখে বলেছিলেন, বোঝলেন নতুন ডাক্তার ভক্তিবাদীর দৃষ্টিতে দেখলে তিনি অবতারকল্প।

ধুস অবতারকল্প ! যত্ত সব গাজাখুরি কথা ! অথচ বলা যায় না। কাউকে চটাতে নেই। কারো বিশ্বাসে আঘাত করতে নেই। সে গদগদ হয়ে বলেছিল, বলেন কি ?

হুঁ সোজা কথা না ডাক্তার। চার ফোঁটা করে চারবার চোখে ড্রপটা দিতে বললে ! সেরে যাবে বলছ।

সেরে যাবে।

কিন্তু বুঝলে ডাক্তার সামান্য তেল সিঁদুর দিয়ে নিজ দেবত্বের কথা গাঁয়ের লোকদের বুঝিয়ে দিলেন তান্ত্রিক বাঁকাবিহারী। সংসারের

কারো কাছে আর লুক্কায়িত রাখিলেন না এবং পাপীতাপী সবাই তার অভয়পদে আশ্রয় লাভ করল। ঈশ্বররূপে তাঁর আত্মপ্রকাশের পর থেকেই সমবৎসর মাঘের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে মেলা বসতে থাকল।

ঈশ্বরের কথায় বুড়ো পণ্ডিতের ভাষার তারতম্য হয়ে যায়, সাধু চলতির মিশ্রণ ঘটে—শত হলেও অবতার রূপে সেই তান্ত্রিক এখনও দ্বাদশবৃক্ষে বেঁচে আছেন।

বুঝলে ডাক্তার, তখনকার শাস্ত্রকাররা ব্রাহ্মণী শাস্ত্রের লক্ষণ মিলিয়ে তা প্রমাণ করারও চেষ্টা করেছিলেন। শেষে নরহরি পণ্ডিত চোখ বুজে বললেন, আমার জ্ঞানবাদীর দৃষ্টিতে দেখলে আলাদা অবতার কি ? সব জীবাত্মাই তো স্বরূপত পরমাত্মার সঙ্গে অভেদ। প্রত্যেকের মধ্যে প্রসুপ্ত রয়েছেন ঈশ্বর। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ঈশ্বর হওয়ার সম্ভাবনা—জীবের মধ্যে শিব। আমরা তান্ত্রিক বাঁকাবিহারীকে শিব জ্ঞানে ধ্যান করি। নতুন ডাক্তার, আছে, সব আছে। দেখবে রাতে বিরেতে পিচাশিতলায় গেলে তোমার গা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। তিনিই ঠাকুর পঞ্চতীর্থের উপর ভর করেছেন। তন্ত্রসিদ্ধ পঞ্চতীর্থ এখন এলাকার ঠাকুর।

শিবস্তোত্র জানো ডাক্তার ?

আজ্ঞে না।

লিখে দিয়ে যাব। পিচাশিতলা পার হবার সময় স্তোত্র জপ করলে তোমার শরীর হাল্কা হয়ে যাবে।

সুধাময় সাইকেল থামিয়ে দূরের অন্ধকারে সেই দ্বাদশ বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে আছে। জমাট অন্ধকার ঝুলে আছে আকাশে মনে হয়। আঁধার কত অধিক হয় এই নির্জন রাস্তায় গাঁয়ের শেষ প্রান্তের পিচাশিতলা তার এখন সাক্ষ্য দিচ্ছে। লাটুবাবুর আমবাগানে ঢুকে যাবার অন্য কোনো রাস্তাও নেই। এতটা বিচলিত হওয়ায় নিজের উপরই তার কেমন ধিক্কার জন্মাল।

সে প্যাডেলে চাপ দিতে গিয়েও পারল না। কেমন স্থবির এবং ভারি মনে হচ্ছে শরীর।

হরিদ্রাভ পিচাশিনী।

ভৈরবীর শেষ বেশ।

ছিলেন অন্নপূর্ণা, শতবর্ষ পার করে হয়ে গেলেন ধূমাবতী। ফোকলা দাঁত, গাছের নিচে মন্দির প্রকোষ্ঠে বাস। ছিন্নবাস, রুক্ষ চুল। সাদা শোনপাটের মতো চুলের ওড়াউড়ি। মানুষ কাছে যেতে ভয় পায়। ফল মূল ছুঁড়ে দিয়ে আসে। তাজা খেকো রাক্ষসীর মতো

দুলে দুলে লাঠি হাতে বেড়ায়। কুমারী মেয়ে রজঃস্বলা হলে, তার বস্ত্রখণ্ড সে দাবি করতে থাকে। আতঙ্কে তাও দেয় গেরস্থ্ গরীব জনমজুর সবাই। তারা গাছের ডালে বস্ত্রখণ্ডটি বেঁধে দিলে নারীর কল্যাণ হবে মনে করে। অজন্মা খরা হবে না মনে করে।

সুধাময়ের কোনো প্রশ্ন নেই। সে শুধু শুনে যায়। তার মন সংশয়বাদী নয়, যুক্তিবাদকে প্রশ্রয় দেয় না, জড়বাদী বিজ্ঞানেও তার বিশ্বাস নেই— অন্তত পণ্ডিতের সামনে একজন ভক্ত শ্রোতা ছাড়া কিছুই নয়। সিনিয়র দাদাদের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। মনে রাখবে তুমি সমাজ সংস্কারক নও। দেশে তো সমাজ সংস্কারকের আকাল ছিল না। রামমোহন ঈশ্বরচন্দ্র রবি ঠাকুর জগদ্দল পাথরটির এতটুকু আলগা করতে পারেনি। বাবা তোমার ছাপোষা মানুষ, ছাপোষা জীবনই তোমার উপাস্য দেবতা। পাথরটি নড়াতে গেলে নিজেও নড়ে যাবে।

আসলে পণ্ডিতের গুরুগম্ভীর কথা শুনতে শুনতে কখন যে নেশা ধরে যায়। রেকর্ড প্লেয়ারে ক্যাসেট ভরে দিয়েছিল। পণ্ডিত চলে গেলেই ইফফাত আরা খানের ক্যাসেটটি চালিয়ে দেবে। সে রাত জেগে পড়ে। প্রিনসিপল্‌স অফ ইনটারনেল মেডিসিন বইটি এখন তার কাছে যে কোনো ধর্মগ্রন্থের চেয়ে অমূল্য। নেফ্রলজি চ্যাপ্টারটা কিছুতেই বাগে আনতে পারছে না। গাঁয়ে এসে অখণ্ড অবসর যেন মিলে গেছে। একমাত্র পণ্ডিতই অসুখ বিসুখের অজুহাতে এসে বসে থাকে। আরও অনেকে আসে। তবে গল্প জুড়ে দেয় না। কাজের লোক গুরুপদ, চা করে দেয়। এই লোভেও বসে থাকতে পারে।

সামান্য ভলিউমে মিউজিক কিংবা গান বাজলে পড়ায় সে বেশি মনোযোগী হতে পারে। ক্যাসেটের সংগ্রহও তার কম না। ইদানীং এই নিভৃত পল্লী অঞ্চলে রাতে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনতে শুনতে কখন যে সেই গানটি—তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ—শোনার জন্য কেন যে মন তার আঁকুপাঁকু করতে থাকে সে বোঝে না।

বুঝলে নতুন ডাক্তার দ্বাদশ বৃক্ষের একটি বৃক্ষের ডালও বাদ যায়নি। কেউ না কেউ আত্মঘাতী হয়েছে। রুদ্র ভৈরবী তিথিতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পরদিন থেকেই মেলা বসে।

সে আর সায় দিতে পারেনি।

কী বলেন, গাছ কখনও প্রাণ নিতে পারে। সে তো ছায়া দেয়, ফুল দেয়, ফল দেয়। গাছের মতো প্রিয় প্রতিবেশী মানুষের আর কে আছে।

নেয়। নেয় ডাক্তার। তুমি জান না। গাছের ইশারা না পেলে, কার সাধ্য পিচাশিতলার মাঠে রাতে যায়। হাতছানি না পেলে কার সাহস আছে গাছের মগডালে উঠে গলায় দড়ি দেয়। বিধি নির্দিষ্ট সব। তুমি তো ডাক্তার—এ বারে দ্যাখো কার কপালে সেটা লেখা আছে! ঠাকুর পঞ্চতীর্থ ঘোষণা করে দিয়েছেন সামনেই রুদ্র ভৈরবী তিথি।

এরপর সুধাময় বাক্যহারা হয়ে গেছিল।

কিছুটা ধাতস্থ হবার পর পণ্ডিত বলেছিল, এলাকার মানুষেরা বিশ্বাস করে। করবে না! এই যে এ বারে মাঠে প্রেতযোনির আবির্ভাব ঘটেছে, ছোটবংশী নিজে দেখেছে। এখন লাটু যদি দেবীধ্যানে তার আরাধনা না করে, পার পাবে তোমরা! নতুন ডাক্তার গাঁয়ে যখন আছ, দোষ গুণ তোমাকেও পেতে পারে। বলছি না তোমাকে পাবে, পেতেও তো পারে। সংশয়বাদী হতে যেও না। এই পিচাশসিদ্ধ গাছ সব পারে। কাকে হাতছানি দেবে, আর ঘোরে পড়ে গিয়ে গাছের ডালে উঠে বসে থাকবে কেউ বলতে পার না।

তারপর থেমে বলেছিলেন, অবিশ্বাসীদের ক্ষমা নেই জানো!

না না, আমি কিছুই অবিশ্বাস করছি না।

সব ধর্মেই এই সূচটি ফোটানো আছে। তুললেই রক্তপাত। অন্ধ বিশ্বাসের তাড়া না থাকলে মানুষের স্বভাবকে কব্জায় রাখা সোজা না। এটা বোঝো!

সে বেশ ঘোরেই পড়ে গেছিল। পণ্ডিত রাতের বেলাতেই আসেন। তিনি গালগল্পে বেশ রাত করেই ফেলেন। ডিসপেন্সারি না থাকলেই তিনি উদয় হবেন। রবিবার তার ডিসপেন্সারি বন্ধ থাকে। বলাই কেরাণীর বাইরের ঘরটা বেশ আলগা। ঢিবি মতো একটা উঁচু জায়গায় বলাই কেরাণী বেশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘরগুলি তুলেছে। মূল বাড়িটা ইটকাঠ দিয়ে তৈরি। আব্রু আছে। তার ঘর থেকে পাঁচিল দেখা যায়। পাঁচিলের বাইরে ঘর। পেছনে বাঁশের জঙ্গল। সামনে পুকুর। ঘাটলা বাঁধানো। পণ্ডিত উঠে গেলে দরজা খুলে বের হতেও সে সাহস পায় না।

সব কেমন মরা মরা, নির্জীব মনে হয়। তার বাথরুম ঘর সংলগ্ন নয়। তবে সেখানে শুধু চানই করা যায়। বাইরে হারিকেন জ্বালিয়ে রাতে বের হতে হয়। পোকামাকড়ের উপদ্রবও কম নেই। ঠাণ্ডায় পোকামাকড়ের আতঙ্ক থেকে রেহাই পেলেও পিচাশিতলা তার মনের মধ্যে কেন যে এত ত্রাস ঢুকিয়ে দেয় কিছুতেই বোঝে না।

বুঝলে ডাক্তার, সেই ভৈরবীই নিশীথে আর গাছে থাকতে পারে না। দেবী দিগম্বরী হয়ে ঘোরে। তুমি একা থাকো। সাবধানে চলাফেরা করবে। বুঝলে বছরে দু-বছরে মেলা বসে। বছরে দু-বারও মেলা বসত। ইদানীং পিচাশিতলায় কেউ আত্মঘাতী হতে যাচ্ছে না। ঠাকুরের দিন দিন দুর্ভাবনা বাড়ছে। কেউ আত্মঘাতী না হলে রুদ্র ভৈরবীর তিথিও আসে না। মেলাও জমে না।

কিন্তু সাবধানটা হয় কি করে।

আমবাগানের রাস্তাটায় যায় কি করে।

যেতে হলে খালের কোমরজল ভেঙে ও পারে উঠতে হয়। তারপর মাঠ ভেঙে যাওয়া যায়।

এই কনকনে ঠাণ্ডায় ইচ্ছা করে!

সব ভিজে যাবে। অবশ্য সে উলঙ্গ হয়ে খালের জলে নেমে যেতে পারে। অন্তত প্যান্ট জুতো মোজা খুলে নিলে এবং খাল পার হয়ে, সাইকেল কাঁধে নিয়ে উঠে গেলে শরীর ভিজবে, প্যান্ট ভিজবে না। জাঙ্গিয়া জুতো মোজা কিছুই ভিজবে না। তারপরই মনের দুর্বলতা পরিহার করার জন্য সে ভাবল, যা হয় হবে।

আসুক। ডালপালা নুয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। সে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না—যার কোনো অস্তিত্বই নেই, কিন্তু নেই বললেই তো পার পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের জুজু আর ভূতের জুজুর এক তিল ফারাক নেই টের পেতেই গায়ের রোমকূপে ঝড় বয়ে গেল।

মনে হল সত্যি পিচাশিতলা তার দিকে এগিয়ে আসছে। হালকা কুয়াশা আর অন্ধকারে সচল হয়ে উঠছে দ্বাদশ বৃক্ষ। হাওয়ার ঝড় বইছে। গাছগুলো বোধ হয় উড়তে শুরু করেছে। গাছের ডালে অজস্র কুমারী যোনির রক্তবাস। কেমন দুর্গন্ধ উঠছে।

তার ঘোর শুরু হয়েছে বুঝতে পেরে সাইকেল থেকে নেমে পেচ্ছাপ করা যায় কি না চেষ্টা করছে। শারীরিক ক্রিয়ায় যদি ঘোর থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। জাঙ্গিয়া খুলে দাঁড়িয়ে আছে অথচ বিন্দুমাত্র ক্রিয়া না করায় বুঝল, শরীরের বোধশক্তি কমে আসছে। সে এ বার দম বন্ধ করে শারীরিক কষ্ট বোঝার চেষ্টা করল। তারপর জোরে নিশ্বাস নিয়ে বুঝল, ঘোর থেকে মুক্তি না পেলে সে এই পিচাশিতলাতেই মরে পড়ে থাকবে।

একটা কুকুর ডেকে উঠলেও সে সাহস পেত।

সামনের দিকে সে তাকাচ্ছে না। তাকালেই কেন যে মনে হচ্ছে আকাশের নিচে এক খণ্ড কালো মেঘ এগিয়ে আসছে। কখনও

মেঘের মতো, কখনও ঢিবির মতো আবার কখনও গাছ বিচিত্র হয়ে নাচানাচি করছে।

সে বুঝল, রাতের নির্জনতার মধ্যে জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে থাকলে এমনই হবার কথা। সে গাঁয়ের এমন ভুতুড়ে রাত্রি জীবনেও প্রত্যক্ষ করেনি। কোনো এক অপরিচিত গলার স্বর দূর থেকে শোনা যাচ্ছে।

কি বলছে বোঝা যাচ্ছে না।

সে সাইকেল চালিয়ে প্রায় চোখ বুজে ঊর্ধ্বশ্বাসে পিচাশিতলা পার হতেই সহসা পেছনের ক্যারিয়ারে কে যেন চেপে বসল। যেই চাপুক, পেছনে তাকিয়ে দেখার সাহস নেই। কোনও ভারি জিনিস সে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—সে যক্ষ রক্ষ দানব ভূত প্রেত যাই হোক, আমবাগানে ঢুকে না যাওয়া পর্যন্ত নিস্তার নেই। গাছের হাতছানি তাকে কিছুতেই কাবু করতে পারবে না। তার বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাই তাকে সচল রেখেছে বুঝতে কষ্ট হল না।

এবং আশ্চর্য এক সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে তার চারপাশে। কুয়াশা এবং অন্ধকার পাশাপাশি থাকায়, ছায়ার মতো ক্যারিয়ারে কিছু বহন করে নিয়ে যাচ্ছে টের পেল। সে এ বারে সত্যি ঘামতে শুরু করেছে।

গাছের আড়ালে কেউ যদি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে, সহজেই লাফিয়ে ক্যারিয়ারে বসে যেতে পারে। তবে সে কে!

জানো নতুন ডাক্তার আমি অভিসারিকার মতো হয়ে উঠতে চাই। জানো অবনঠাকুর ও রকম কোমলতনু মুখ এঁকেছিলেন তাঁর ছবিতে।

আতঙ্কে যে খুবই ক্যালানে মার্কা হয়ে যাচ্ছে নিজেও বুঝতে পারছে। তবু নিরুপায়। কিছুতেই হুঁ হা ছাড়া অন্য কথা মাথায় আসছে না।

দা ভিঞ্চির মোনালিসার মতো কপাল চাই।

হবে।

বতিচেলির আঁকা ভেনাসের মতো থুতনি চাই।

দা ভিঞ্চির নাম সে জানে। ভেনাস একটি বিখ্যাত চিত্রকলা, তাও সে জানে। তবে বতিচেলির নাম সে শোনেনি।

বতিচেলি কে? বলতে পারত। কিন্তু সাহস নেই। সে পূর্ববৎ বলল, হবে।

ফাঁসোয়া পাসকালের আঁকা সইকির মতো দু চোখ।

তার মাথা ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত মাথাটি

কিন্তু তা কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছে না। মাথাটি তার মাথাতেই আছে ভাবতেও অবাক লাগছে।

সে ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, হবে।

কিন্তু আপনি কে, আমার পৃষ্ঠদেশ অবলম্বন করে কোথায় যাবেন, এমন সঙ্গত প্রশ্নের বিন্দুমাত্র চিন্তা করার তার সাহস নেই।

ফঁতেইন ব্লো ঘরানার 'ডায়না'র মতো নাক।

ফঁতেইন কিরে বাবা। নাকি সুরে সব কথা। কিছুই বুঝতে পারছে না। সে ডাক্তার, সে জীববিদ্যার কিছু রহস্য জানে, কিন্তু প্রেতিনীরা নাক মুখ বদলের জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠেছে জানবে কি করে।

ক্যারিয়ার আর তার পৃষ্ঠদেশ এখন তার কাছে সমান। চাঁপা ফুলের গন্ধ। কখনও মনে হয় লজেন্সের মিষ্টি গন্ধ, আবার কখনও চকলেট চকলেট গন্ধ। পৃষ্ঠদেশে যিনি অবস্থান করছেন, এটা তারই গায়ের গন্ধ হবে। কিংবা ভুর ভুর করে গাছগুলি গন্ধ ছড়াচ্ছে—এমনও মনে হল তার। সিনিয়ার দাদাদের পরামর্শ খুবই কাজ দিচ্ছে। যা বলবে সায় দিবি। কমপ্রোমাইজ করবি। কনফ্রন্টেশানে যাবি না। মানুষ হোক ভূত হোক মাস্তান হোক, পুলিশ হোক, পঞ্চায়েত প্রধান হোক—সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবি।

সে মিলেমিশে থাকার জন্যই হবে বলছে। হবে না বলছে না। হবে না বললেই, কেন হবে না, এখন তো সব হয়। হবে না বলছ কেন। তুমি কিছু জান না ডাক্তার। তোমার কিচ্ছু হবে না।

তখনই মনে হল পৃষ্ঠদেশ থেকে আবার কথা ভেসে আসছে।

আমার চাই ইউরোপা নামে নারীটির মতো সুন্দর মুখ। মেয়েদের আরও সুন্দর দেখতে কে না চায়!

নির্ঘাৎ কোনো বিদেশিনী হবেন তিনি। যখন এত সব বিশ্বজয় করা চিত্রকলার নাম করে যাচ্ছে, তখন কোনো বিদেশিনী না হয়ে যায় না। তাই বলে এমন একটা অজপাড়াগাঁয়ের পিচাশিতলায় এসে আশ্রয় নেওয়া যে ঠিক হয়নি বোঝায় কি করে!

ঘোরের মধ্যেও সে যে বেজায় সাহসী বুঝতে প্রেতিনীর আদৌ অসুবিধে হবার কথা নয়।

সে বলল, এত সব নাক মুখ চোখ কপাল জোগাড় করাই তো মুসকিল। তুমি ইচ্ছে করলে তো নিজেই করে নিতে পার। দিগম্বরী দেবী হয়ে ঘুরছ শুনছি...

আমি আবার কবে দিগম্বরী হয়ে ঘুরলাম ডাক্তার। দেব গাট্টা মেরে। কে না কে ঘুরছে...বলেই পলকে কেমন লাফিয়ে নেমে

আমবাগানের ভিতর হাওয়া হয়ে গেল। ভার নেই। সে ক্লান্ত, তার পৃষ্ঠদেশের ক্যারিয়ার খালি। আর কিছুটা যেতেই অবাক হয়ে দেখল, আকালের বউ ময়না ডেঁড়িকুপি হাতে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

ডাক্তারবাবু এত রেতে এ দিকে।

বাসায় ফিরছি।

এ রাস্তায় ক্যানে ? ভুল রাস্তা। যাবেন তো মল্লারপুরে, এইটে গেছে সুলতানপুরে। আসেন আমার লগে। বেনেপাড়ার রাস্তায় আপনারে তুলে দিয়ে আসি।

॥ তিন ॥

আঘুনের শীতে বড় কাবু আজ ছোটবংশী।

সকাল থেকে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে। দু-দিন অবিরাম ঝড় বৃষ্টি গেছে। আকাশ মেঘলা। শীত না পড়তেই এই হাল। কনকনে ঠাণ্ডায় হাত পা টাল। গায়ে খুট। সাঁজ বেলায় সড়কি হাতে বের হয়েছে মাঠে যাবে বলে।

এক হাতে সড়কি, আর হাতে কাঁথা একখান। লণ্ঠন একখান।

সূর্য না ডুবতেই কেমন অন্ধকারে গাছপালা ঘরবাড়ি আবছা হয়ে উঠেছিল, রাত নামতেই সুনসান সব।

এক পেট খেয়ে বের হওয়া। বের হবার সময় লাটুবাবু বার বার সতর্ক করে দিয়েছে—ধান কে খায় রে ?

কে খায় সে জানে না। তবু কর্তাকে খুশি করার জন্য বলেছিল, পোকামাকড়ে খায়। ধান মনুষ্যে খায়।

লাটুবাবু বলেছিল, পোকামাকড় কব্জার বাইরে। তবে নজর রাখবি। ধানের কাঠি দেখে বুঝিস না। পোকামাকড়ে খেলে একরকম। মানুষে খেলে একরকম। যাস তোরা জাগালদারি করতে, বোঝ রাখিস।

ছোটবংশী বোঝে, 'বোঝ রাখিস' কথাটা পিলের মধ্যে হড়কা বান। ব্যাটারা ডেরায় পড়ে ঘুমায়, কে খায়, কিসে খায় দ্যাখে না ! এক পেট গিলে যায়, মধ্যরাতে অচেতন। পোকামাকড়ে খেলেও তোরা দেখিস না, মানুষে খেলেও না। ফ্যাকলু দিয়ে কাম নাই, বললেই হয়ে গেল !

পড়ে পড়ে ডেরায় তোরা ঘুমাস। খবর পাই না মনে করিস ! না ঘুমালে জমিতে ধানের কাঠি ঘাড় ত্যাড়া করে ডাঁরায়। বুঝ নাই তর !

বোঝ নাই তর, কথা ঠিক না কর্তা। আলে আলে হাঁটাহাটি,

তালপাতার ডেরায় মুখ বার করা থাকে, কেউ নিদ্রা যায় না।

মনে মনে সে বলে, এই হলগে ল্যাটা ছোটবংশীর। সব কথা কর্তাকে খুলে বলতে ডরায়। সব কথা সে নিজের লগে কয়। ঘর থেকে বের হবার মুখে, পিচাশিতলার দিকে করজোড়ে দাঁড়ায়। বিড় বিড় করে মন্ত্রপাঠ করে। দেবীর থানে মনে মনে মাথা ঠোকে। তারপর উর্ধ্বমুখি হয়, শেষে অধোমুখ। তারপর সড়কি আর কাঁথাখান পাশে রেখে দু-হাত ছড়িয়ে মাথা ঠোকে মাটিতে।

এই কাজটা হয়ে গেলে সে মনে বল পায়। যুস আসে শরীরে। দেবদেবী ভূত প্রেত যক্ষ রক্ষ সবাইকে তোয়াজ করে তার বের হওয়া। খুটখানা গায়ে দিয়ে কাঁথাখানা কাঁধে ফেলে বের হয়ে পড়া। জাগালদারদের অবিশ্বাসী হলে চলে না। পঞ্চা গাজীর মতো ঘাড় মটকে বিলের জলে কে কখন পুঁতে দেবে সেই আতঙ্কও কম না।

লাটুবাবুর বিশাল দোতলা বাড়ির এক কোনায় সে, পলা, মোহর, পড়ে থাকে। খড়বিচালি দিয়ে তাদের ঘরখানা পুকুরের এক পাশে। জাম জামরুলের ছায়ায় ঘরখানিতে ওম আছে। মাটির দেয়াল, একখানা খাটিয়া সম্বল। দিনের বেলা হাল বলদের তদারকি, রাতে জাগালদারি। বিশ্বাসী মানুষের নানা হ্যাপা। লাটুবাবুর সব কিছু ঠিকঠাক রাখার দায় তার।

কর্তার অনুগত জনের অভাব নাই। তবে সে আছে এক নম্বরে।

ওরে ছোটবংশী।

আজ্ঞে যাই।

পুকুরে জাল ফেলা হবে, দেখিস।

বাদিয়ারা থেকে ধানের বিছন দিয়ে যাবে। আঁটিগুলি গুনে রাখিস!

নিমতলা থেকে ডিজেল আনবি। টাকা রাখ।

জমিতে ট্রাকটার নামবে। সঙ্গে যা।

কর্তার ঘরবাড়ি, কন্যে এলে তার তদারকি, টাকার থলে গোঘাটে থেকে নিয়ে আসা। দুটো বাস চলে বাবুর, একটা মিনিবাস—সকালে সাইকেল চালিয়ে যায়, দুপুর হয়ে যায় ফিরতে। ব্যাগে কত টাকা থাকে সে জানে না। হরমোহনবাবু থলের মধ্যে চিরকুটে টাকার অঙ্কখানি লিখে দেন—তার কাজ শুধু বহন করা। ছোটবংশীর এটাই গর্ব। তার বিশ্বাসের নম্বর এক।

সেই ছোটবংশীকে কর্তা আজ তড়পেছেন।

মন খারাপ ছোটবংশীর।

ধান কে খায় ?

বিষম দায়। ধান কে খায় ! কর্তা কখনও মিছে কথা বলেন না। সত্যি তো ধানগাছে ছড়া থাকে না। গাছে ছড়া না থাকলে হেলে থাকবে কেন ! সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। জমির পর জমিতে অগুনতি কাঠি—ধান মনুষ্যে খায়, পোকামাকড়েও খায়। না খেলে হজম হচ্ছে কি করে !

সব কথা কর্তাকে খুলে বলতে সে ডরায়।

সব কথা সে নিজের লগে কয়।

তবে খুব কওয়া বলার সে মানুষ না। ট্যারা কথাবার্তারও অর্থ বোঝে, কিন্তু প্রতিকারের বিধান জানে না।

প্রতিকারের বিধান না জানলে যা হয়, ক্ষেপে যায় ভিতরে। ধান কে খায় সে জানে। আবার জানেও না। পোকামাকড়ে খায়, মনুষ্যে খাবে না হয় কি করে : পোকামাকড়ে খেলে কোনো দোষ নাই, মনুষ্যে খেলে দোষ।

তার হাঁটা দ্রুত বাড়ে। আমবাগানের ভিতর ঢুকে এদিক ওদিক কি দেখে ! ঘাস পাতা হিমে ভিজে আছে। জোরে হাঁটলে, শরীরে গরম ধরে। কিন্তু লণ্ঠনখানার আলো ঠিক থাকে না। হাওয়ায় কাঁপে। ফুঁ দিয়ে নিভিয়েও দিতে পারে। তবে দেয় না। পিচাশিতলার মাঠ পার হয়ে যেতে হয়। হাতে আগুন থাকলে ডর থাকে না। আগুনের কাছে তেনারা বিষম কাবু। পিচাশিতলা পার হলে লণ্ঠন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় নিজেই। এ' মাঠখানাই যত আতঙ্ক। আর তার বৃক্ষ সব। এমন জড়াজড়ি করে থাকে যে আলাদা বৃক্ষ বলে রাতে চেনাই যায় না। দেবী চামুণ্ডার মন্দিরে পূজারি পূজা দেন ভর সন্ধ্যায়। মন্দির প্রকোষ্ঠে প্রদীপখানি জ্বালা থাকলে মন হালকা থাকে। পূজারি ভিতরেই আছেন। পঞ্চতীর্থ মশাই, খড়ম পায়ে নামাবলি গায়ে—তিনি ধ্যান পূজা, আরতি করছেন। তাঁর কাছে দেবদেবী ভূতপ্রেত সবাই জব্দ। তাড়াতাড়ি গেলে, তিনি থাকতেও পারেন, আবার নাও পারেন। তবে রাস্তা থেকে দূরের গাছগুলোর অন্ধকারে আলোর ইশারা থাকলেও মনে বল পাওয়া যায়।

হলে কি হবে, তার এই এক দণ্ড ফুরসত মিলে গেছে। মাঠে নামার আগে এক পলক আকালের বউকে দেখে যাবার তার বাসনা। এই বাসনা বড় মারাত্মক ব্যাধি। লাটুবাবুর মহল্লা ছাড়া হতে পারছে না ওই এক ব্যাধির কবলে পড়ে।

এক পলক দেখে যাবার বাসনাতেই এই ঘুরপথে আসা।

দুটো মিষ্টি কথা কওয়া আর কি ! না আর কিছু না। আকালের বউ ময়না দাদা দাদা করে। আবার ক্ষেপে গেলে তু তুকারিও করে।

চারটে বাচ্চা, স্বামী শাউড়ি নিয়ে তার ঘর। আকালের বউ চোখ ট্যারা করে তাকালে সে ভড়কে যায়। ভিতরটা আবার গুড়গুড় করেও ওঠে। এ-যে কী এক আদিখ্যেতায় সে জড়িয়ে পড়েছে বোঝে না। তার সাহসও নেই।

সে লাটুবাবুর এক নম্বরের বিশ্বাসীজন। আকাম কুকাম তার সাজে না। ময়না বুঝতেই চায় না—এত অবুঝ রমণীর পাল্লায় পড়ে সে কিছুটা বেকুফ।

ইজ্জত বলে কথা। সে ছোটবংশী, কোনো বেইমানি জানে না।

লাটুবাবুর পরিবারের এই একখানা কথাও তাকে বেশ মজিয়ে রেখেছে। বিশ শালের উপর বন্দক আছে লাটুবাবুর মহালে। মহাল ছেড়ে যাবার কোনো প্রক্রিয়া তার জানা নেই।

ছোটবংশী কোনো বেইমানি জানে না। মানুষের এটা কত বড় ইজ্জত সে বোঝে। বোঝে বলেই সে আকালের বউর পাছার শাড়ি মনে মনে তুলে মজা পায়—হাত দিতে সাহস হয় না। কেলেঙ্কারীর শেষ তবে। একটুখানি হাসি, একটুখানি ঠাট্টা তামাসা—ব্যস হয়ে গেল। এতেই সে এত মজা পায় যে ডুবসাঁতারে ভরা গাঙ পার হয়ে যেতে পারে। মিষ্টি কথায় মজে যাওয়া আর পাছার কাপড় তুলে হাত দেওয়া—ভিন্ন কথা। হিম্মত লাগে।

আসলে ছোটবংশী জানে, সেটাই তার নেই। সে মিষ্টিকথা কইতে জানে, তবে হাত দিয়ে কব্জা করার কৌশলটা তার জানা নেই। আকালের বউ ঠিকই বলে, ছোটবংশী তুমি একটা ম্যাড়া।

ও দাদা, জাগালে যাচ্ছ !

ময়না ধান ভেনে ফেরার পথে হাতে লণ্ঠন দেখেই টের পেয়েছে। ছোটবংশী জাগালে যাচ্ছে।

ছোটবংশীর এই এক জ্বালা। সামনে একরকম, ভিতরে অন্যরকম। পাত্তা না দেওয়াই ভাল। কে কোথায় দেখে ফেলবে ! এত দেখতে ইচ্ছে করে, অথচ সামনে পড়ে গেলেই ক্ষেপে যায়। ময়নাকে বেহায়া নির্লজ্জ ভাবে। স্বামী শাউড়ি নিয়ে তর ঘর, গতর নিয়ে মোচ্ছব শুরু করে দিলি ! পরপুরুষ দেখে মজে গেলি ! এটা কাজের কথা লয়।

জাগালে যাচ্ছি কি যাচ্ছি না, তর কি ! রাস্তা ছাড়।

আমি কি হাতি ! রাস্তা তোমার আগলে রেইখেছি।

হাতি না, তু একটা বাঘ। যারে পাস তারে খাস।

ময়না চোখ তুলে খল খল করে হেসে উঠল।

তোমারে কবে খেলামগ বংশীদাদা!

কথায় পারার জো আছে। ঘন মিষ্টি আবছা আঁধার। হাতে লণ্ঠন। কেন যে সে ঘুরপথে আসে! তার মন পরিষ্কার নয় সে বোঝে। কিন্তু ময়নার বার-ভাতারি তার পছন্দ না। মানুষের মঙ্গল অমঙ্গল বলে কথা। আকাল এত আবাল মানুষ! না হলে ময়না জোর পেত না। রাত করে ধান ভেনে জঙ্গলের রাস্তায় ঢুকে যেতে ও পারত না। ভেবেছিল, বাড়ির দরজায় দেখা হয়ে যাবে, আসলে সে চায় ময়না দেখুক লাটুবাবুর সে কত বিশ্বস্তজন। তাকে জাগালে পাঠাচ্ছে, সোজা কথা!

আসলে ছোটবংশী জানাতে চায়, জাগালে কে যায় দ্যাখ। ছোটবংশী যায়।

জাগালে রোজ ছোটবংশী যায় না। মেহের যায়, পলা যায়। ছোটবংশীর কাজ কত। যাবে কখন! বাজার হাট, গদিতে যাওয়া, গরুর গাড়ি হটর হটর করে নিমতলার গঞ্জে তুলে দিয়ে আসা, চালের কলে ধানের ওজন ধরিয়ে টাকা গুনে আনা—কত তার কাজ! কাজের কি শেষ আছে। কাজ না থাকলে জাগালে।· বাবুর ধন্দ, ধান পোকামাকড়ে খায় না। মনুষ্যে খায়।

সে লাটুবাবুর পরম বিশ্বাসভাজন, তারে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে জাগালদারি চেক করানো।— হুট হাট কেউ যদি আসে, সড়কি ফিকে জখম করা। কোর্ট কাছারি করতে হয় করা যাবে। —ধান মনুষ্যে খায় রে। পোকামাকড়ে খায় না। ধানের ছড়া বেমালুম খালাস।

লাটুবাবুর ওই এক ফরমান।

চোখ খোলা রাখ। টের পাবি মনিবের হয়রানি কে করে! ডেরায় পড়ে না থাকলে টের পাবি না কে খায়।

সে যাচ্ছে জাগালে। যাবার পথে ময়নাকে দেখে যাবার বাসনা— সেই ময়না জঙ্গলের রাস্তায়। কাঁকে কাঠাখান সম্বল করে তাকে নিয়ে মজায় মেতেছে।

ধান কে খায় না জানলে চলবে ক্যানে দাদা! মনিবের কত আঁটি আর বাঁধবে। জীবন তো বন্দক রেইখে দিলে! যাচ্ছ জাগালে, লাটুবাবুর বউ খেতে দিয়েছে ত! খেলেটা কী?

ময়না পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না। অন্ধকারে ঝোপ

জঙ্গলে ময়নার সামনে পড়ে গেলে কথা উড়তে পারে। লণ্ঠনের আলো নিভিয়ে দিতে পারছে না। পিচাশিতলার মাঠ যে তাড়া করছে! যায় কোথায়!

কওনাগো দাদা, লাটুবাবুর বউ তোমাকে কী খেতে দিল! বড় জানতে ইসছে করে। তুমি কী খেইয়ে বের হইলে বলনাগো!

ছোটবংশী ক্ষেপেও যেতে পারে না। সে ভাল মন্দ খায় ঠিক। মাঝে মধ্যে পিঠে পরমান্নও জোটে। তার আহারের বৃত্তান্ত শুনে ময়না সুখ পায়। ময়না নিজে খেতে পায় না, শুনে সে পরমান্ন ভোজনের তৃপ্তি পায় ছোটবংশী এটা বোঝে। দেখা হয়ে গেলেই, তার এক কথা, কী দিয়ে খেলেগ দাদা। গরীব মানুষের কপাল এইরকমেরই। আকাল আর ময়নাকে না দেখলে উৎকৃষ্ট গরীব মানুষের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

সে বলল, গরম ভাত, আলুকপির তরকারি, ডাল।

আলুকপি!

ময়নার জিভে জল চলে আসে।

ভাত ঠেসে খাওতো দাদা!

ঠেসে না খেলে সারারাত জাগালদারি করি কার জোরে!

সেই। বলে ময়না কাঁখের কাঠাখানা নিচে উবু হয়ে নামায়। ধান ভেনে তুষ মিলেছে। তুষের কাঠাখানা যতটা হালকা হবার কথা তা যেন নয়। খুদকুঁড়ো সঙ্গে থাকলে ভারি হতেই পারে। নামাবার সময় উবু হয়ে থাকে ময়না। নামাবার সময় উবু হলে, পাছার ভাজ দু'খান, জোড়া কচ্ছপের পিঠ। শাড়ি দিয়ে শরীরখান কোনোরকমে প্যাচিয়ে রেখেছে। জেলজেলে শাড়িতে টাল হয়ে থাকে শরীর। লণ্ঠনের আলোয় সবই কিছুটা দেখা যায়, কিছুটা যায় না। ছোটবংশী এটুকু দেখলেই শরীরের জোর হারিয়ে ফেলে। ময়না উবু হয়ে থাকে আর ফিক ফিক করে হাসে।

কিগো কী দেখছ!

সর ময়না।

আমি তো সরেই আছি। যাও না।

ময়না যেন কাঠার মধ্যে হাতড়ে কি খোঁজে। তুষের গরম খুঁজতে পারে। তবে কি খোঁজে জানতে বাকি থাকে না। শরীর গরম হয়ে যায়—ছোটবংশী চোখে সর্ষেফুল দেখে।

একদিন না একদিন তাকে ময়না খাবে। খেলেই সে দুর্বল হয়ে পড়বে বোঝে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। ময়না তার মৃত্যুবাণ

ছেড়ে উবু হয়ে আছে। সোজা হচ্ছে না। শাড়িখানা হাত দিয়ে তুলে দিলেই কাত।

পাড়াগাঁ জায়গা। জঙ্গলের পথটায় মানুষজন বিশেষ আসে না। ময়নার এ-রাস্তাটা সটকাট তাও বোঝে সে। লাটুবাবুর বাড়ির ধান ভেনে সে ফিরছে। কলের চাল বাবুরা খায় না। সমবৎসরের চাল আকালের বউ করে দেয়। ঢেকিশালে ময়না পড়ে থাকে। লাটুবাবুর বাড়ির ধান ভেনে ফিরছে। তুষ, সঙ্গে চালের খুদ। কিছু গোপনে পাচার করা চাল।

এই ময়না সর। উবু হয়ে এত কী খুঁজছিস।

ময়নার সাড়া পাওয়া যায় না।

সে বলল, কী এত খুঁইজে মরছিস ময়না। কাঠার ভিতর কী আছে! সর বলছি।

পরমায়ু খুঁইজে দেখছি—আছে কি নাই!

ময়নার কথায় চমৎকারিত্ব আছে। আকালটা কুড়ের হদ্দ। বাপ পিতামহের লাইনে থাকবে। জাত খোয়াবে না।— আরে ব্যাটা খালে বিলে মাছ নাই। ফলিডলে পোকামাকড় মরে, মাছ মরে, মনুষ্য মরে। তুই মাছ মারবিটা কুথি!

পেলি!

হা পেছি।

বলেই মুঠ করে কি তুলে আনল তুষের ভিতর থেকে। লণ্ঠনের আলোয় মুঠ আলগা করে কাঠায় আবার ছেড়ে দিল। হাওয়ায় উড়ে গেল তুষ। মণি মাণিক্যের মতো কটা চাল তুষের উপর উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাকে চোর বলেও যদি ঠ্যাঙায়, হাতখানা ধরে সরিয়ে নিজে উবু হয়ে যদি দেখে! হাতখানা টেনে ধরলেই সে ছোটবংশীকে ঠিক কাত করে ফেলতে পারবে— কিন্তুক ছোটবংশীর সে মুরদও নাই। পাছার কাপড় তোলা দূরে থাকুক হাত টেনে চোর সাব্যস্ত করারও মুরদ নাই। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

তুমি দাদা কি গা! কিছু নাই তোমার? সড়কি নিয়া শিকারে যাও—সড়কিতে ধার নাই। ধার দিতেও জান না। লাটুবাবুর অন্ন ধসাও, ধারের খবরটাই রাখ না। তোমার যে মরণগ দাদা।

ছোটবংশী খুব গম্ভীর হয়ে গেল।

জানিস জমি থেকে ধান চুরি যায়।

তোমার যে দাদা জীবন বিফলে যায়গ দাদা। কার ধান চুরি যায়। কে খায়?

লাটুবাবুর। আবার কার।

কে চুরি করে!

কে নেয় সেই ল্যাটা। ধানের ছড়াখান থাকে না। কাঠিখান ডাঁড়িয়ে থাকে।

আহাগ ধানেরও মরণ দেখছি এ-সালে!

সালটা ভাল না জানিস! আমাদের পঞ্চতীর্থর গাওনা শুরু হয়ে গেছে জানিস! বৃক্ষ কারে তুলে নেয় দ্যাখ। দেবী তো রোষে দিগম্বরী হয়ে মাঠে নেইমে পড়েছে। দেবীর কোপে কে যায় দ্যাখ। মন ভাল না। রাস্তাখান ছাড়। আকাম কুকাম কইরতে নাই। পাপে তাপ বাড়ে। শেষে সব জ্বলে যায়। বোঝ রাখিস।

শরীল যে অবোঝ দাদা। শরীলতো বোঝে না। বুঝলে পুরুষ মানুষের এত ঠ্যালা খেতে হয়। সর সর বলে। ইজ্জত নাই, ধম্ম নাই—দাঁড়িয়ে থাকি!

ময়না কাঠাখান কাঁখে তুলে নেয়। চোখ জলে ভার হয়ে আসছে। নির্লজ্জ বেহায়া সে—না হলে ছোটবংশীর সামনে পথ আগলে দাঁড়াবে কেন। তার মান অপমান নেই, সে খুবই ছোট হয়ে গেল। ময়নার অভিমান হতেই পারে।

সে বিয়ে থা করেনি। সেই বালক বয়সে লাটুবাবুর বাপ বানের বছর তাকে লিয়ে এসেছিল।

ময়না তখন গামছা প্যাচিয়ে পরে। বুকে গামছা জড়িয়ে রাখে। ছোটবংশী গরু বাছুর মাঠে দিতে গেলে ময়না দৌড়ে যায়। গরুর দড়ি ধরে ছোট বংশীর কাজে সাহায্য করে। লাটুবাবুর পুরনো চাকর বংশী তখন অন্নজল ত্যাগ করেছে। পুকুর পাড়ের ডেরায় পড়ে থাকে। শিয়রে বসে ছোটবংশী অন্নজল দেয়। সে না থাকলে কোথা থেকে ময়না উদয় হয়। গাছপাতার রস করে খাওয়ায়। কেউ যার নাই ময়না তার আছে। সে যেখানে ময়না সেখানে। তার কাজ কর্মও ময়না ভাগ করে নিতে ভালবাসে। কিসের টানে এটা হয় সে তখন বুঝত না। এখন বোঝে। বোঝে বলেই ধম্ম আছে তার। ময়না দশ ভাতারি হয়ে যাবে ভেবে কষ্ট হয়।

ময়নার মা সকালে উঠে চলে যেত পুলিশ ক্যাম্পে রান্না করতে। রাতে ফিরত ময়নার খাবার নিয়ে। কলাই করা থালায় ভাত ডাল মাছ—গামছার পুঁটুলি নিয়ে বাড়ি ঢুকলেই ময়না আহ্লাদে আটখানা। কিছুটা খায়। কিছুটা জল দিয়ে রেখে দেয়। ভালমন্দ হলে ছোটবংশীকেও ডেকে খাওয়াত। পরম আহ্লাদ ছিল সেই

খাওয়ানোতে।

খাও দাদা। একখানা মাংসের হাড় দিই।

না না। আর লাগবে না। বাবুরা টের পাবে।

টের পাবে না বলছি। তুমি খাওতো। পুলিশ ক্যাম্পে পাঁঠা কাটা হয়েছে। বেশিটা মাকে দিয়েছে। অত খেতে পারি না। তোমার জন্য রেখে দিয়েছি।

এই নাও সন্দেশ।

এই নাও পায়েস। খাও, খাও। আমার তো খাওয়ানোর লোক নাইগ। তোমার কেউ নাই, আমারই বা কে আছে! মার নিন্দামন্দে কান পাততে পারি না। স্বভাব ভাল না বলে। আমার কি দোষ কও। আমার মা যাবেই বা কোথায়। গতর আছে, গায়ে গায়ে পুষিয়ে দিচ্ছে। খুব কদর মা-এর। দু'পাঁচটাকা হাত ধরেও দেয়। তুমি আবার খারাপ পাওনা তো!

না না, তোর মা করে, তুই করিস না। আমি খারাপ পাব কেন? গরীব মানুষের গতর ছাড়া আর আছেই বা কি!

তাই বল। বলতে বলতে গামছাখান জড়িয়ে আরও কাচুমাচু হয়ে বসে। নতুন লজ্জা সবে তখন ময়নার দেখা দিয়েছে শরীরে। ফ্রক একখানাই সম্বল। যেতে আসতে লাগে। ডেরায় কিংবা জঙ্গলে সম্বল দু-খান গামছা। একখানা কোমরে, অন্যখানা বুকে। ময়নার মধ্যে জংলিভাব তখনই সে টের পেয়েছিল।

বছরও ঘোরেনি। ঘটে গেল এক বিষম কাণ্ড।

ময়নাকে উলঙ্গ অবস্থায় সেই সে একবার দেখেছিল।

লাটুবাবুর বাবার তখন সে খাস চাকর। মেলা গরু বাছুর গোয়ালে। গরু মোষ এক পাল। তার কাজ ছিল গরু মোষের পাল নিয়ে মাঠে নেমে যাওয়া। চাষ আবাদ হয় না, এমন মুল্লুকে তাকে যেতে হয়। আবাদের জমি পার হয়ে বড় একটা ডাঙা—ডাঙা উঁচু হতে হতে ওটা হাসখালির দিকে উঠে গেছে। নাবাল জমিতে গমের চাষ— শ্যালো বসিয়ে বাবুরা তিন ফসল ঘরে তুলছে।

সেই একবার একটা গরু ছুটে গেলে ময়না গরুর খোঁটা জোরে চেপে ধরেছিল। কোথা থেকে ময়না উদয় তাও সে জানে না। মা বাড়ি না থাকলে যা হয়—এ-বাড়ি, ও-বাড়ি, জঙ্গল থাকলে আরও ভাল। সে পালের গোদা দুটো ষাঁড়কে খোঁটা পুঁতে সবে জমিতে উঠেছে তখনই কাণ্ডখানা ঘটে গেল।

ষাঁড়টা ময়নাকে নিয়েই ছুটছে। দড়ির সঙ্গে প্যাচিয়ে গেল।

ঘাসের উপর ময়না পড়ে গেছে। গরুর খোঁটার সঙ্গে দুখান গামছাই উড়ে চলে যাচ্ছে। ছোটবংশী দৃশ্যটা দেখে দৌড়।

খোঁটা থেকে সে গামছা আনতে গেছে।

ময়না কি করে আর ! লজ্জা নিবারণের জন্য উবু হয়ে গমের খেতে নিজেকে আড়াল করেছিল।

ছোটবংশীর তখন মরণ।

ও ময়না তু কুথিরে। গামছা ধর।

ময়না শুধু কু দিচ্ছে। গম খেত গভীর গহন হয়ে আছে। গাছের নিচে ডুবে গেলে কেউ দেখতেও পাবে না। কেবল ছোটবংশী জানে, তার লজ্জা নিবারণের উপায় নাই। যদি সে কু শুনে গম খেতে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকে দারুণ মজা।

ও ময়না, জবাব দে, তু কুথি ?

কুউ। কুউ।

যেন কুকিল ডাকছে গম খেতের অভ্যন্তর। কেউ জানেই না ময়না দিগম্বরী হয়ে বসে আছে গম খেতের ভিতর।

ছোটবংশী আলে আলে হাঁটে। কুউ করছে, কিন্তু ময়না কোনখানটায় বুঝতে পারছে না। যত বুঝতে পারছে না, তত ক্ষেপে যাচ্ছে।

ময়না তখন নিজেকে উবু হয়ে দেখছিল। ছোটবংশীর পরনে গামছা। গামছাখান খুলে নিলে কেউ দেখার নেই—বোঝার খুব বয়স না দু-জনের। বড় হচ্ছে এই পর্যন্ত। শরীর শির শির করে, গমের সবুজ শিষের মতো— বড় হচ্ছে সব কিছু, তবে পরিপক্ক নয়। আধকাঁচা, না তাও না। ডাঁসা—তাই বা বলে কী করে ?

খুঁজুক। খুঁজতে খুঁজতে গম খেতে ঢুকে গেলেই সাপ্টে ধরবে। উলঙ্গ হয়ে গোপনে বসে থাকার মধ্যেও একটা মজা আছে— সেই মজায় সে মাঝে মাঝে, কুউ কুউ করে ডাকছে। মানুষ না, পক্ষী ডাকছে।

অরে পক্ষীবালা, তর পক্ষ নাই বুঝে লিস। কুউ কুউ করিস কোন সাহসে। উড়াল দিয়া যাবিটা কুথি। সাড়া দে। কুউ করিস না। হাতখানা তুলে দে গম খেতের উপর। বুঝি কুউ আসছে কোত্থেকে।

ময়না কিছুতেই হাত তোলেনি। হাত তুললেই জমিতে ঢুকবে না। আল থেকে গামছা ছুঁড়ে মারবে। তারপর দৌড়। লাটুবাবুর বাপতো বংশীর যম।

মরণ হবে তুর বুলে দিচ্ছি ময়না।

হোক মরণ। এক কথা ময়নার। সে ফের কু করল।

বংশী বড়ই ফাঁপড়ে পড়ে গেছে। কী যে করে!

রেগেমেগে বলল, থাকল তোর গামছা।

যেদিক থেকে কু ভেসে আসছিল, গামছা উড়িয়ে দিল ঠিক সেদিকে।

যাক ভেসে, তুই পক্ষী হয়ে আছিস, থাক। গামছা উড়ে গেলে তুইও পক্ষী হইয়ে উইড়ে যাইবি।

ময়না বুঝল হবে না। সে গম খেতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। কোমরের কাছাকাছি গমের শিষ দুলছে। হাওয়া দিলে নুয়ে পড়ছে শিষ। তখন তার নিম্নাঙ্গও স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ময়নার কী সাহস! সবই দেখা যাচ্ছে। বংশী পালাতে পারলে বাঁচে।

মাঠে দূরে অদূরে কেউ যে নেই তা নয়। তা ছোটবংশী সড়কে পাঁচন হাতে মোষ চরাতে এয়েছে, কার কী দেখার আছে!

ময়না জমির আলে আলে দৌড়ায়, গাছের ছায়ায় বসে থাকে—সকালে এক পেট পান্তা খাইয়ে মা আবাগি গেছে ক্যামপে, বাপের সে খবর রাখে না, বাপ ছেল কি ছেল না জানে না, গাঁয়ের মসজিদের কুয়ার ধারে সাধুবাবার ডেরা, ডেরা পার হলে লাটুবাবুর লাট—দু লাট দু লফতের, এক লফতে দাশু করের লাট আর এক লফতে লাটুবাবুর লাট, ওর মা থাকে দুই লাটের মাঝখানের জায়গাটায়। সাধুবাবা দেখলে বলত, চললি ময়না। প্রকৃতিই হেতু।

এত বড় একটা সাম্রাজ্যে সে বিচরণ করে বেড়ায়, কেউ দেখে ফেললে কচু হবে। অন্তত ময়নার হাবভাব দেখে বংশী তাই ভেবেছিল। নষ্ট নারীর কন্যে সুবিধার হবে না যেন জানা সবার।

মা এসে ঘরে না দেখলেই খুঁজতে বের হবে।

কোথায় যে যায়!

ওরে চললি কোথায়?

কন্যারে খুঁজতে সাধুবাবা। ময়নাকে দেখেছেন।

কুথি আর যাবে! গাছপালা শস্যক্ষেত বাড়ে। তা সৃষ্টি বড় অবুঝ বুঝলি—কাউরে রেহাই দেয় না। তোর কন্যে পার পাবে কেন। গেছে কোথাও।

সেই কন্যে গম খেতে দাঁড়িয়ে থাকলেও কোনো ডর নাই। না হলে পারে! ঝুপ করে উঠল, এদিক ওদিক দেখল তারপর ভুস করে ফের ডুবে গেল গমের জমিতে।

সাধুবাবার কথাই ঠিক।

কামনা বাসনা হলগে ঝিড়ালের থাবার মতো, শিকার দেখলেই গোঁফ বের হয়ে আইসে।

ময়নার মাকে সাধুবাবা বলত, বুঝলি না বেটি ভগবানের দয়ায় সব চলছে। চলছে বলেই তুই আমি, চলছে বলেই শীত গ্রীষ্ম, চলছে বলেই হাঁটু গেড়ে মন্দির মসজিদ। তা তুর কন্যের এখন সব চাই। ঘরে আটকে রাখবি সে জোর কোথায়। দেহ অতি মন্দবস্তু বুঝলি। সে আকাল বোঝে না, সে গরম হলে সৃষ্টির লয় প্রলয় শুরু হয়। যেছিস যা, আমি আছি। দেখতে পেলে ঘরে পাঠিয়ে দেব।

দেহ অতি মন্দ বস্তু কথাখান ময়নারও সাধুবাবার কাছে শোনা।

আর তখনই ছোটবংশী না বলে পারল না, গমখেতের গরম তর এতকালেও মরল না। তোর হবেটা কী ! কাগা বগায় ঠুকরে খাবে তোরে দেখিস !

ময়না চলে যাচ্ছিল, ফের ঘুরে দাঁড়াল। ফুঁসে উঠল।

কী বুললে ?

কি আবার বুলব ?

কাগাবগায় ঠুকরে খাবে ! খাক। একশবার খাক। তাতে তোমার কি।

কাগাবগার কথা উঠতেই ময়নার সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল। গমখেতের গরম। তা আছে। গরম আছে বলেই ছোটবংশীর এত তেজ। গরমে চরম কিছু করে ফেলতে পারে সেই আতঙ্ক ছোটবংশীর। লাটুবাবু নিজেই বড়শি ফেলে বইসে আছে। সে খুট দিচ্ছে না। সে যে বারো ভাতারী নয়, তারও যে ধম্ম আছে, লাটুবাবু ধরতে এলে হাত কামড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল। তবে লাটুবাবু ছাড়ার পাত্র না সে বোঝে। শরীরে গরম ধরলেই জঙ্গলে রাত বিরেতে হাঁটে। দুম করে কিছু করতে পারে না। পঞ্চায়েতের মা বাপ, দশ গেরাম তারে মান্য করে, খেলিয়ে তুলতে চায়। সোহাগ দেখিয়ে কব্জা করার তালেও ছিল। আকালকে ভাল মন্দ খেতে দিয়ে বশ করার চেষ্টা করছে। সে সবই বোঝে, তার কি দোষ, শরীর তার গরম না হলে লাটুবাবুর কোমরে ঠ্যাং তুলে দেয় কি করে ! ছোটবংশী তুমি একটা ম্যাড়া। জোয়ান মানুষ না তুমি, নেড়ি কুত্তা একটা।

সাধুবাবাই বলেছিল, কাগাবগার দেশে ফেইলে বাপ তর চলে গেল। যা পাবি খাবি। যে যা দেয় নিবি।

সে ঘরে ঢুকে বলেছিল, মা, কাগাবগা কে মা !

শোনে। চুরি চামারিতে ফেঁসে গেলে লাটুবাবুর ওই একখানাই কথা—প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত। ভেঙ্গে দাও। গুঁড়িয়ে দাও। তার বড় ডর লাগে।

দাশু কর বলেছে, জমি তার।

লাটুবাবু বলেছে, দাশু ভাই তুমি পতিত জমি ফেলে রাখার লোক! তোমারে আমি চিনি না!

আকালের বাপ লাটুবাবুর লোক। কেচ্ছা কেলেঙ্কারী জানাজানি হলে রক্ষে নাই। দাশু করের চক্রান্ত। আকালকে জড়াচ্ছে!

ফাঁপড়ে পড়ে বলেছিল ময়না, কি দেইখবে?

জমি সরেস কত দেইখতে ইসছা হয়।

আকালের চোখে কাতর মিনতি। তা এই শরীর এত গরম ধরে ময়না নিজেও টের পায়নি এতদিন। তার শরীর অবশ হয়ে আসছে। আকালের চোখ থেকে শরীর সরাবারও উপায় নাই। আকালের চোখে আগুন জ্বলছে।

আগুন ঠিক না, আগুন ধরাবার ম্যাচকাঠি। বারুদ ভাল করে জমে নাই। বারুদ ঘসলেই আগুন লাগবে।

তবু যা হয় সৃষ্টির অতল রহস্য। জাপটাজাপটি সার। এবং তখন দেখা গেছিল, হুড়মুড় করে গাছের ডগাগুলি ভাঙছে, লেপ্টে যাচ্ছে জমিতে। যেন দুটো প্রাণী হুটোপুটি করে শস্য বিনষ্ট করছে।

আর তখনই কে যেন সড়কে নেমে ডাকছিল, ও আকাল কুথি গেলি!

আকালের বাপ আকালের খোঁজে বের হয়েছে।

ধরমর করে উঠে বসেছিল ময়না।

এই ছাড়। তুর বাপ হাকড়ালছে।

আকাল দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে গেলে গামছাখান পড়ে থাকল। ময়না ফিস ফিস গলায় ডাকল, আরে আকাল, তুর গামছাখান নে। গামছাখান নিয়ে প্রায় নুয়ে দৌড়। তারপর পাতিখান মাথায় করে অনেক দূরে গম খেতের আলে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আমারে বাপ খুঁজতেছিস। যেন আকাল ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না।

কুথা ছিলি! তুর মা বুলছে, আকাল ঘাস কাটতে গেল, ফেরে না ক্যানে। মাঠে কি তারে রাক্ষসে খেয়েছে?

আকালের বাপের পরনেও খুট। কাঁচাপাকা চুল মাথায়। জলজ

ঘাসপাতা লেগে আছে হাতে পায়ে। খালি গা। সারা সকাল জলে ভিজে হাত পা সাদা। ঠোঁটের দু-কষে ঘা।

আকাল দৌড়ে যাচ্ছিল। বাপকে বুলছে, কি মাছ পেলি বাপ!

তা পেয়ে লিছি। লাটুবাবুরে দিয়ে আয়। দাশু কররে দিয়ে আয়। আর বাকিটা নিমতলার হাটে। তুই যাবি। শিখে লে। খালে বিলে মাছ নাই, সব ফলিডলে খেতে বসেছে। বাবুরা কৃপা না করলে বাঁচবিনে।

আকাল দৌড়ে যাচ্ছিল।

ময়না জমিতে দাঁড়িয়ে একটা গমের শীষ দাঁতে কাটছিল কুটকুট করে। আকালটা তার সব কিছু দেখে লিয়েছে। এই মাঠ গাছপালা সবই সৃষ্টির মাতনে মেতেছে। কুকুর বেড়াল হাঁস মুরগি সেও সৃষ্টির মাতন। তার মধ্যেও সেই মাতন, মাতন লেগেছে বলেই ইসছা হয়—তর সনে পীরিত কইরে নদীর জলে ডুইবে মরি। কোন এক বাউল শীতের মাঠ পার হয়ে গেয়ে যায়।

সে যত গমের শীষে দাঁত বসাচ্ছিল তত তার কেমন শীত শীত করছিল। সেও এক দৌড়ে বাড়ি এসে ঝুপড়িতে মাদুর বিছিয়ে কেমন এক অলস আতঙ্কে কুঁকড়ে শুয়েছিল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

॥ চার ॥

ঈশানী শুয়েছিল। লেপের ওম ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না। রাধুনিমাসি চা রেখে গেছে। হাত বাড়িয়ে নিতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। খুবই ঠাণ্ডা পড়েছে। করিডোরে কাচের জানালায় সকালের রোদ। সে চোখ মেলে বুঝল, বেলা হয়েছে। চা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে পারে ভেবে প্লেট দিয়ে ঢেকে রেখে গেছে। সে সকালে ঘুম থেকে উঠেই লেবু চা খায়। এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। পেটে বায়ু জমে না। হালকা থাকে শরীর। চা খেয়েই, পায়চারি, তার পর বাথরুম। এটাচড বাথে সারা রাতই নীল আলো জ্বলে। তার ঘরেও। মনে হয় সে নীল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে। লোডশেডিং নেই। ইনভার্টার আলাদা। অটোমেটিক। একটা গেল তো আর একটা চলে এল। সে লেপ সরিয়ে উঠে পড়লেই মীরাদি ঘরে ঢুকবে। তার নিজস্ব কাজের লোক। পাশে তার বসার ঘর। তারপর দরজা। মীরাদি রাতে করিডোরে শুয়ে থাকে। সে না উঠলে কেউ তাকে ঘাটাতে সাহস পায় না।

তার হাই উঠল দু-বার। সে নাইটি টেনে হাঁটুর নিচে নামিয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। বিছানার চাদর ওয়াড় সব হালকা নীলরঙের। তার উপর গোলাপী ফুল ফলের ছবি। টাইলস বসানো মেঝে। সে হাঁটলে প্রতিবিম্ব ভাসে। দেয়াল ডিসটেম্পার করা। একটা দাগ নেই। এই ঘরে আর আছে কিছু দেশীবিদেশী ফ্যাশান ম্যাগাজিন। সারাদিন সে উপুড় হয়ে ফ্যাশানের কাগজগুলি পড়তে বড় ভালবাসে। পড়তে পড়তে শরীরের জন্য অদ্ভুত সব টোটকাও পেয়ে যায়। তার তো ইচ্ছে হয়— কত যে ইচ্ছে। ফ্যাশানের কাগজগুলির মডেলের ছবি দেখতে দেখতে কখনও যদি মনে হয়— আহা এর রূপতো ফেটে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে লাফ— বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এক হাতে ফ্যাশানের কাগজ অন্য হাতে সৌন্দর্যচর্চা শুরু হয়ে যায়। না, শরীর রঙ তার, ছবির চেয়ে উজ্জ্বল। না— চোখ তার বিস্ফারিতই আছে। টলটল করছে চোখ দুটো। হাত মেলে বাহুর লাবণ্য, শরীরের লাবণ্য দেখতে দেখতে নিজের সৌন্দর্যেই কেমন বিভোর হয়ে যায়।

চোখে মুখে জল দেওয়া দরকার। গরম-ঠাণ্ডা মিলিয়ে হাত ডুবিয়ে দেখার স্বভাব। বেশি গরম হলে ত্বকের সৌন্দর্য নষ্ট হতে পারে। কুসুম কুসুম গরম জল, আঙুল ডুবিয়ে দেখে নেওয়া ? আর তার পর মুখে চোখে জল ছিটাতেই আয়নায় কি দেখে ঘাবড়ে গেল।

ও মা গালে লালমতো ফুসকুরি। কালও তো ছিল না। ইস কি যে হবে না ! আমার কিছু ভাল লাগছে না। ও মীরাদি শিগগির এস। মাকে ডাকো। বাপিকে ডাকো। আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।

মীরা তটস্থ থাকে। দরজার ওপাশ থেকে নড়ে না । সকাল বেলায় আবার কী হল ! কখন যে কি দুর্ভোগ শুরু হবে বোঝা মুসকিল। সে ছুটে গিয়ে বলল, কি হল দিদিমনি, সকাল বেলাতেই আর বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বেলা বাড়লে কি হবে !

মীরাদি দ্যাখো গালে আমার কি হয়েছে ?

ও কিছু না। সেরে যাবে। ব্রণ হয়েছে। এটা এ-বয়সে হয়।

সকালে উঠে কত কিছু ইচ্ছে ছিল তার। সকালটা রাজস্থানি সাজে সেজে ঘুরে বেড়াবে। রোদে বসবে। সে জানে রাজস্থানের শুষ্ক আবহাওয়ায় রঙের ছোঁয়া আসে রাজস্থানি নারীর পোশাক পরলে। লাল, হলুদ, সবুজ পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্যের প্রতীক রঙই রাজস্থানি সুন্দরীদের শোভা। এদের পোশাক ঘাঘরা-কাচুলি-কুর্তা পরলে তার

শরীর হাল্কা হয়ে যাবে— কী আনন্দ। নরম বালিশের ওমের ভিতর সে কত কিছু না ভেবে রেখেছিল। ওড়নিতে কাচ বসানো। অ্যাপ্লিকা বা সুতোর কাজ করা, সিফনের উপর বান্দনি— আহা কি না দারুণ। জরির কাজের রাজস্থানি পোশাকটা পরার—তার কতদিন থেকে ইচ্ছে। পরেনি ইচ্ছেটা যদি নষ্ট হয়ে যায়।

চোলির ছাটেও থাকবে কিছু রদবদল। কত কাজ তার সকালে। যোগব্যায়াম, কাঁচা হলুদ গুড়, তারপর এরোবিকস। সে ভেবেছিল আজ রাজস্থানি পোশাক পরে ব্রেকফাস্ট সারবে।

ঘাগরা চোলির সঙ্গে আনুষঙ্গিক হিসাবে হালকা ধরনের রাজস্থানি বালাও পরবে ইচ্ছে ছিল। মাথায় টিকলি। কানে রুপোর লম্বা ঝোলা দুল। গলায় তমানিয়া। পায়ে মল, নাগরাই চটি। মাথার চুলে সাপের চেয়েও ঝকমকে টাসেল।

ইস কি যে খারাপ লাগছে না।

আমার গালে মীরাদি ব্রণ কেন হয়! বিশ্রী কালো দাগ একদম সহ্য করতে পারি না। নতুন ডাক্তার কিছু যদি জানে। শোনো আমি যাচ্ছি।

মা হাজির। লাটুবাবুও হাজির। আবার কি নিয়ে অশান্তি কে জানে!

বাপি দেখ আমার গালে না কি হয়েছে! খড় খড় করছে। ধার ধার। বাপি আমার কি হবে!

কিছু হবে না। রসুন ঘসে দাও মিলিয়ে যাবে।

গালে কালো স্পট পড়লে কি হবে বাপি!

কালো স্পট পড়বে না। রসুনের অনেক গুণ জানো? রসুন অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতা রাখে। সর্দি কাশি সারায়। রক্তচাপ, কলেস্টরেল কমায়। দু-চার কোয়া রসুন থেঁতো করে ঘসে ঘসে লাগাও। দেখবে মুখের ব্রণ আবার মিলিয়ে যাবে।

রসুনের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারব না বাপি।

ভুবনেশ্বরী ক্ষিপ্ত, মেয়ের কাণ্ড দেখে। খুবই মুটিয়ে যাওয়ায় হাঁটার সময় মনে হয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। জলহস্তি বিশেষ। তার আবার ক্ষিপ্ত হওয়ার কি আছে! একটাইতো মেয়ে— দশটা নয়। একটা মেয়ের আবদার রক্ষা করতে পার না দশটা বিয়োলে কি করতে! স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, সকাল বেলায় আর মেজাজ খারাপ কোরো না। আমি সামলাচ্ছি।

রসুন পছন্দ না হলে চন্দন বেটে লাগাও।

না আমার কিছুতেই সারবে না। নতুন ডাক্তারের কাছে যাব। সে বলতে পারবে।

আরে চ্যাংড়া ডাক্তার, সে কিছু জানে।

বারে জানবে না, ডাক্তারের কত কেলি আছে জানো। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে ওর সিরিয়েল কত জান ?

আমার জেনে কাজ নেই। তুমি চুপ করে বসো। এখুনি চন্দন বেটে দিচ্ছে, লাগাও। এ বয়সে ব্রণ হয়।

কেন হয় বাপি।

লাটুবাবুর মাথা খারাপ হয়ে যায় এমন আদিখ্যাতা দেখলে। বলতে পারতেন শরীরে গরম ধরলে হয়। তবে বললেন না। তিনি একটি পাতলা কম্বল গায়ে দিয়ে উঠেছেন উপরে। গরম উলের গেঞ্জি গায়। এত ঠাণ্ডায় ঈশানীর শরীর গরম— এখন আবার নতুন ডাক্তার, নতুন ডাক্তার করছে। কাল কুকুরছানা নিয়ে পড়েছিল। আজ ডাক্তারের ছানাকে চাই।

তোমাকে যেতে হবে না। ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার যখন আমার কথা বিশ্বাস হয় না ডাক্তারই দেখুক।

ডাক্তারের ছানা বলছ কেন বাপি। কত কিছু জানে। জানো ওরা ডিসেকসান রুমে মরামানুষ কাটাছেঁড়া করেছে। এন্ট্রান্সে আঠারো ভাবা যায় না। আমি তো তিনবার বসলাম। একবারও পেলাম না।

ওসব ধরা করার ব্যাপার।

তুমি তো পারতে। আমার কত ইচ্ছে ছিল— আমার কিচ্ছু হবে না। তুমি ধরা করা করলে না কেন বাপি। নতুন ডাক্তার আমাকে পাত্তা দেবে কেন। ওতো জানে তিন তিনবার লাড্ডু। আমার মাথায় কিচ্ছু নেই। কাল ডাকলাম, পাত্তাই দিল না। গট গট করে চলে গেল।

লাটু আছ, লাটু।

বৈঠকখানায় কেউ ঢুকল। মনে হয় পঞ্চতীর্থ কাকা। কাকার রুদ্র ভৈরবী আবির্ভাব তিথি নিয়ে মাথা খারাপ। এবারে কে আত্মঘাতী হবে কে জানে। তিথিটি বড় কাঁচাখেকো। তান্ত্রিক মানুষ। সহজে মন্দির ছেড়ে বের হন না। বিপাকে না পড়লে তার কাছে কেউ বড় আসেও না। তারই গলা মনে হচ্ছে।

ও লাটু, লাটু।

আজ্ঞে যাই কাকা।

গুরুজনদের আজ্ঞে আপনি করার স্বভাব। পঞ্চতীর্থ কাকা তাঁকে

এখন এলাকার রত্নস্বরূপ ভাবেন। পঞ্চতীর্থ কাকার বিধান ছাড়া লাটুবাবুও এক পা নড়েন না। কখন অশ্লেষা, মঘার প্রকোপ— ত্রিপাদ দোষ, কখন শুভ সময়, সবই পঞ্চতীর্থ কাকার বিধানে হয়। তাঁর নানা উপদেশ— এ দেশের কর্মগুলি প্রায় জন্মান্ধ ও কর্মান্ধ দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কি পণ্ডিত কি অপণ্ডিত কেউ এর ভালমন্দ বিচারে উৎসাহী অথবা শক্তিমান নন। প্রতিদিন সকালে উঠে রুদ্রসূক্ত পুরুষসূক্ত পাঠ করবে।

দুটো সূক্ত পাঠ করে লাটুবাবুর যে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ছে এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার হাতে নাতে ফল পেয়েছেন। বিরোধী পার্টির একজনই জিতেছে। দাশু করের সাম্প্রদায়িক মনোভাবই জেতার মূল কারণ লাটুবাবু এও বিশেষ বোঝেন। এটা যে বিশেষ ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে তাও না। তবে রেকর্ড জন্মনিয়ন্ত্রণের তালিকা তৈরি করতে হলে দাশু করকে দরকার। ফান্ডের নামে টাকা তোলা যাবে ঠিক, একটাই দুঃখ শালা দাশু কর ভাগ বসাবে। আধাআধি বখরা চায়।

মাথায় কত গোলমেলে বিষয় ঘোরাফেরা করে— ঈশানী বিন্দুমাত্র বুঝতে চায় না। এক্ষুনি তাকে বের হয়ে যেতে হবে— উপজাতি কল্যাণ সমিতির মিটিং-এ। ব্রণ নিয়ে এত মাতামাতি করা কি সাজে!

লাটুবাবু নামতে পারছেন না। ঈশানীকে ঠাণ্ডা করা দরকার। তাকে সাহসী করে তোলা দরকার। বড় একগুঁয়ে, জেদি, ইংরাজি স্কুলে পড়িয়ে মাথাটি খাওয়া হয়েছে এও বোঝেন। ভীষণ দুঃসাহসী। পিচাশিতলায় কাল কৃষ্ণাচতুর্দশীর পূজা ছিল। সে একাই সেখানে চলে গেছে। একাই ফিরেছে। পঞ্চতীর্থ কাকার কি যে দরকার ছিল বলার, ঘণ্টাকর্ণ পলাশ পাতার রস একদিন অন্তর তিনবার লাগালে খুসকি সেরে যাবে।

কোথায় পাওয়া যাবে!

পিচাশিতলায় আছে। পাতা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। দ্বাদশ বৃক্ষেই আছে কিছু পরজীবী গাছ। কোনোটা ঘণ্টাকর্ণ পলাশ, কোনোটা কুচ লতা। ঘোর অন্ধকার না হলে পাতা গজায় না। যে মাখবে তাকেই তুলতে হবে।

কার বিধান, না পঞ্চতীর্থ কাকার।

আরে কি হল লাটু। দিদিভাইর মেজাজ বিগড়েছে!

কাকা কি করি! বলছে মরে যাবে।

মরে গেলে হয় দিদিভাই! কে ভোগ করবে লাটুর বিশাল

সাম্রাজ্য। মরে গেলে সব যে ভূতে খাবে। কি হয়েছে দিদিভাই।

আমার ব্রণ হয়েছে দাদু।

পঞ্চতীর্থ এই শীতেও একখানা নামাবলি গায়ে এসেছেন। প্রাতঃস্নান সেরে বের হয়েছেন। লাটুকে ভজানো দরকার। লাটুই পারে। দেবী চামুণ্ডার মন্দিরটি সংস্কারের দরকার। সে হাত লাগালে, সবাই এসে জুটবে। কিন্তু লাটুর কিছু অসুবিধা আছে বলছে। সে আড়াল থেকে করতে পারে— এর বেশি নয়। তা ছাড়া এবারে দেবী চামুণ্ডাকে প্রীত করা না গেলে মানুষের নির্ঘাত অকল্যাণ হবে। দেবীর যে রক্তক্ষুধা। রক্তক্ষুধা দেখা দিলেই মাঠে তিনি দিগম্বরী হয়ে ঘোরেন। বছরগুনে জানেন, এই সেই মহাকাল উপস্থিত, যার সম্যক বিধান দরকার।

সেই লাটুই পড়েছে এখন মহাফাঁপড়ে। কিঞ্চিত ম্রিয়মাণ সে। সুযোগ বুঝে বললেন, দিদিভাই কোনো ভাবনা নেই তোমার আমি তো আছি। শিমুলকাটা দুধে ঘষে চন্দনের মতো লাগালেই সেরে যাবে। শ্বেতচন্দন ঘষা হরিণশিঙ ঘষা জল একত্রে লাগলেও ফল পাবে। তারপরই কি ভেবে বললেন, বুঝলে লাটু তোমার গ্রহশান্তি দরকার। বড় অসময় উপস্থিত তুমি তো বোঝো। দেবী দিগম্বরী হয়ে ঘুরছেন। পিচাশিতলার চামুণ্ডার মন্দিরটির সংস্কারে এবারে হাত লাগিয়ে ফেল। তুমি সব পার। রুদ্রসূক্ত, পুরুষসূক্ত পাঠ করলে অসুরশক্তি লাভ করা যায় তুমি জানো। সেই ফল লাভে তুমি এখন কৃতি পুরুষ। তুমি পার না হেন কাজ নেই।

তিনি বলতে পারতেন, পঞ্চা গাজী তোমার বড় কাঁটা ছিল— সে মোক্ষ লাভ করেছে। তাকে সরিয়ে দিয়ে নিমতলার মোড়ের চার বিঘা জমি হস্তগত করে ফেললে। তোমার লোকবল আছে। লোকবল বড় বল। অবশ্য এসব কথা তিনি জানলেও প্রকাশ করতে পারেন না। থানা পুলিশ সব লাটুর কৃপাপ্রার্থী। বর্ডারে যে সোজা রাস্তাখান চলে গেছে থানার বাবুরা বিলক্ষণ জানেন। বর্ডারে পোস্টিং পাওয়া খুবই দুর্লভ। যে আসে সে সরতে চায় না। গেড়ে বসতে চায়। লাটুবাবু কাশলে, তারাও কাশতে থাকেন— এ হেন দৃশ্য বহুবার গোচরে এসেছে। পার্টির আশীর্বাদে তুমি কলিযুগের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেছ— এও বলতে পারতেন। তবে বলা যায় না। কারণ দেবী চামুণ্ডার ক্ষুধাবৃত্তি তবে নিবারণ করা যাবে না। থানমাহাত্ম্যে ভাটা পড়বে। দেবীর নামে পাঁঠাবলি, মোষবলি হলেই চলবে না, ঢাকঢোল বাজালেই চলবে না মেলায় তবে গুঞ্জন উঠবে। দ্বাদশ বৃক্ষ

তো, বৃক্ষ হয়েই থাকল। তার উড়ে গিয়ে ধরে আনার যে কথা, সে গেল কোথায়। দড়িতে কেউতো ঝুলে পড়ল না।

থানমাহাত্ম্য কমলে অর্থ সমাগম কমে। পঞ্চতীর্থ সেবাইত মানুষ। তার পোষ্য পরিবার সব থানের রোজগারে খায়। ফুটানি করে থানের রোজগারে। দিন দিন তা ভাটা পড়ছে দেখে তিনি বিচলিত। পঞ্চা গাজীকে দ্বাদশ বৃক্ষের ডালে ঝুলিয়ে দেওয়ার কাজটা সহজ ছিল না। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বল করে লাটু নেমে না পড়লে হত না। এক ঢিলে দুই পাখি— লাটুই পারে।

লাটুবাবুও বোঝেন তার গ্রহশান্তি প্রয়োজন। পার্টির ওপর মহলে কিছু যে গুঞ্জন উঠেছে তাও তার জানা। নানা যোজনা খাতে টাকার জমা খরচে অমিল থেকে গেছে। বলাই কেরানীটা একটা গাধা। টিপছাপ ঠিক না রাখলে চলে। সব তো এই টিপছাপের খেলা। আমার কি সময় আছে সব খুঁটিয়ে দেখার! তোরা আছিস কী করতে। পার্টির সুনাম দুর্নাম বলে কথা!

কী করতে হবে কাকা!

দিদিভাই কী করছে আগে দেখি।

ঈশানী আয়নার সামনে বসে আছে। সে তার ব্রণ দেখছে। শ্বেত চন্দন দিয়ে গেছে মীরা। পানের বোটায় তা খুব সন্তর্পণে লাগাচ্ছে।

দিদিভাই-এর মেজাজ তো প্রসন্নই দেখছি।

কতক্ষণ থাকে দেখুন।

কি যেন বলছিলে?

একটা মোড়া এগিয়ে দিল মীরা। পঞ্চতীর্থ রোদে আয়েস করে বসলেন। বললেন, গ্রহগণ গোচরে, অষ্টবর্গে, দশাতে বা অন্তর্দশাতে অশুভ হলে তৎপ্রতিকারার্থ বিহিত দানাদি করলে শুভ হয়। দেব-ব্রাহ্মণ পূজা, গুরুজনের বাক্য পালন, সাধুগণের সঙ্গে আলাপ বেদপাঠ, সৎকথা কীর্তন, হোম ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান, মনের পবিত্রতা সম্পাদন, ইষ্টমন্ত্র জপ এবং গ্রহোদ্দেশ্যে দান করলে মানুষ গ্রহপীড়া থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

আমার তো একদম সময় নেই হাতে। ভুবনেশ্বরীকে বলুন সেই সব ব্যবস্থা করবে। ওর বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে কথা উঠবে না। ও করতে পারবে তো?

সে তোমার অর্ধাঙ্গিনী। পারবে না কেন।

একই ফল লাভ হবে তো।

হবে না আবার। বেশিও হতে পারে।

বাপি আমি যাব। নতুন ডাক্তারের কাছে যাব।

লাটুবাবু বললেন, আমি বললেই কি যাবে! কাল যে গেলে, কাকে বলে গেছিলে! তুমি এত দস্যি মেয়ে, রাতে একা চলে গেলে!

একা গেলাম কোথায়। পঞ্চতীর্থ দাদু সঙ্গে ছিল তো।

খুব উদ্ধার করেছ! পঞ্চতীর্থ দাদু সঙ্গে ছিল।

লাটুবাবু তাকালেন তার খুড়ামশায়ের দিকে। ঈশানী সত্যি বলছে!

তা আমি ছিলাম। ঈশানী তোমার সূর্য তনয়া। ভয় ডর জানে না। একা গেলেও দোষের হত না। দেবদেবী যক্ষরক্ষ তাকে কাবু করতে পারবে বলেও মনে হয় না। একাই তো ঘণ্টাকর্ণ পলাশের পাতা নিয়ে ফিরে এল। আমার পূজা হোম ছিল, অপেক্ষা করতে বললাম। মানল না, কিন্তু দিদিভাই তুমি গিয়ে কি করবে! ডাক্তার তো লোটা কম্বল নিয়ে দেশে ফিরে যাবে বলছে। হয়তো এতক্ষণে চলেও গেছে। পিচাশিতলার এক প্রেতিনী নাকি তাকে অনুসরণ করেছে। এখানে থাকলে মরে যাবে বলছে।

চলে যাবে! চলে যাওয়া ওর বের করছি। বলেই ঈশানী একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে গট গট করে নেমে যেতে থাকল।

চলে যাবে! চলে যাওয়া এত সোজা। নামছে আর বিড় বিড় করে বকছে।

সবাই হতভম্ব হয়ে থাকতে পারত— কিন্তু ঈশানীর আচরণই এই রকমের। হতভম্ব হবার সে কোনো সুযোগই দেয় না।

লাটুবাবু কেন কাউকেই সে গ্রাহ্য করে না। পঞ্চতীর্থও সঙ্গে নেমে যেতে সাহস পেলেন না। পিচাশিতলায় গিয়ে রাতে যা করল! চামুণ্ডা থানে দাঁড়িয়ে প্রথমে পঞ্চতীর্থকে ধূমাবতী নাচ দেখাল— তারপর ছিন্নমস্তার নাচ। থানে পূজা মানত পড়ে— সেই থানে উঠে ঈশানী ভূতের নাচ দেখাল। ট্রাউজার আর একটা উলের ফুলহাতা সোয়েটার। স্তন সুপুষ্ট। এই সব নাচ আজকাল টিভিতে দু একবার পঞ্চতীর্থও দেখেছেন। হাত পা ছুঁড়ে, কোমর বাঁকিয়ে, হেলে দুলে, সামনে পেছনে পাছা দুলিয়ে নাচ— কেমন হিস্টিরিয়াগ্রস্ত নাচ। থানে কাড়ি কাড়ি তেল সিঁদুর পড়ে। পিছল কিছুটা। মল্লারপুর জমিদারদের এটি বিশেষ পুরাকীর্তি। কালো পাথরের বিশাল থানটির পাশে বাসি ফলমূলের পচা গন্ধও পাওয়া যাচ্ছিল। এই নয় যে তিনি ঘোরে পড়ে দেখেছেন। দু-বার ঈশানী পিছলেও গেছিল, পায়ের জুতোতে সিঁদুরে মাখামাখি হতেও দেখেছেন। ঈশানীর এই বেয়াদপি

সহ্য করেছেন, লাটু তার বাপ বলে। এ যুগের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী লাটু। তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে কে কখন যাবে কেউ বলতে পারে না। খুন খারাপি আর কেউ এখন বলে না, শুধু বলে লাটুর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগে আবার একটা পড়েছে।

কি নাচ নাচলে দিদিভাই। বড় চমৎকারিত্ব আছে।

ব্যাড গার্ল।

না না তুমি খারাপ মেয়ে হতে যাবে কেন!

ম্যাডোনার ব্যাড গার্ল সিরিজের নাচ। ভূতের নাচ।

দেবদেবী নিয়ে ঠাট্টামস্করা পঞ্চতীর্থের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। শুধু দু-বার মা মা করালবদনী বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। সব তোরই ইচ্ছে মা। তার পরই মনে হল তিনি দিবাভাগে মৈথুনাসক্ত কাক দর্শন করেছেন। এই অদ্ভুত উপদ্রবের হাত থেকে শান্তি পাবার বিধান তার জানা আছে। মৈথুনাসক্ত কাক দেখেও খুব একটা বিচলিত হননি, কিন্তু থানের উপর এই ঈশানীর নাচ দেখে ঘাবড়ে গেছিলেন। সামনে মুখের কাছে কিছু একটা ধরা আছে এমনও মনে হয়েছিল।

দিদিভাই হাতে ওটা কি ছিল।

কর্ডলেস মাইক।

নাচের মধ্যে এত যৌনতার ছড়াছড়ি যে তিনি কাপড় নষ্ট করে ফেলেছিলেন— বয়েস হয়ে যাওয়ায় এই সব দোষ আজকাল তাঁর ঘটছে।

লাটুবাবুর মুখ দেখে এখন মনে হতেই পারে খুবই মোহমুক্ত। ছুটির কটা দিন থাকে। কলেজ খুলে গেলে চলে যায়। কবে যে খুলবে!

যা খুশি করুক।

লাটুবাবুর মুখে কিছুটা বৈরাগ্য সুলভ কথাবার্তা। তবু তিনি সিঁড়ির ক ধাপ নিচে নেমে উঁকি দিলেন। সিঁড়ির নিচে পায়ে জুতো গলাচ্ছে ঈশানী। আর বক বক করছে।

নতুন ডাক্তার আমাকে তুমি অবজ্ঞা করেছ। ডাকলাম সাড়া দিলে না। গট গট করে চলে গেলে। এত দেমাক। এখন কি! এখন পালাতে পথ পাচ্ছ না কেন!

এই একটা দোষ বা গুণ ঈশানীর আছে। মনের ইচ্ছে তার সব কথা হয়ে ফুটে বার হয়। ওর কত যে ইচ্ছে, একটা ইচ্ছের রেশ শেষ হতে না হতেই আবার একটা ইচ্ছে। সে তার ইচ্ছের কথা বলে এক ধরনের সম্ভবত সুখ পায়। তবে সব ইচ্ছের কথাতো সবাইকে প্রকাশ

করা যায় না। ব্রণ উঠেছে। দুর্ভোগে পড়ে গেছে বলে সকাল বেলায় গোলমাল পাকিয়ে বসে আছে। এমন অনেক গুহ্য ইচ্ছে থাকে যা সে প্রকাশ করতে না পেরে মনমরা হয়ে বসে থাকে— তখনই বোধ হয় তার আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না।

রতন আছিস। রতন ?

আজ্ঞে যাই বাবু।

যা দিদিমনির সঙ্গে। দ্যাখ কোথায় রওনা হল।

বাড়িতে গণ্ডাখানেক সাইকেল আছে। ঈশানীর সাইকেল লাল রঙের। লেডিজ সাইকেল। বিকালে প্রায় দিনই উর্বশী সেজে বের হয়। সুযোগ পেলে তার মোটরবাইকটি নিয়েও উধাও হয়। আজ কোনটা নেবে কে জানে।

তিনি নিচে নেমে বৈঠকখানা পার হয়ে দেখলেন, ঈশানী লাল রঙের সাইকেল চড়ে চলে যাচ্ছে। রতন অনুসরণ করতেই সে খাপ্পা। ফিরে আসছে।

এই রে। লাটুবাবু ত্বরিতে উপরে উঠে গিয়ে বললেন, ঈশানী ফিরে আসছে।

পঞ্চতীর্থ গোলমাল বুঝে বললেন, আমি যাই। পরে আসব।

বাড়িতে আত্মীয়স্বজন কম নেই। সব পরগাছা হয়ে বেঁচে আছে। একটা মুখ যদি উঁকি দিয়ে দেখে। তবু টুকি পিসি সাহস করে সিঁড়ির মুখে দাঁড়ালেন।

ফিরে এলি যে ঈশানী।

আমার খুশি। বাপি কোথায়।

ওতো বের হয়ে গেল।

রতনকে কেন পাঠাল। আমি কি রাস্তা চিনি না।

না না রাস্তা চিনবে না কেন। রাস্তা ঠিকই চেন। রতন সঙ্গে গেলে দোষের কি। শত হলেও তুমি মেয়েমানুষ। বাপের মন মানবে কেন ?

ও মা আমাকে মেয়েমানুষ বলছ! জানো মেয়েমানুষ বললে অপমান করা হয়! কখনও বলবে না।

সিঁড়ির মুখে পঞ্চতীর্থ পালাবার জন্য ব্যস্ত। ঈশানী গট গট করে নেমে যাবার সময় বোধ হয় হুঁশ ছিল না। ধাক্কা লেগে গেল। ফিরেও তাকাল না ঈশানী। কে পঞ্চতীর্থ, কে তার বাপ। পঞ্চতীর্থ খুবই কুপিত। জাঁহাবাজ মেয়ে। উচ্ছৃঙ্খল। মাথা খারাপ। কাপড়ের কোচা ঝাড়তে ঝাড়তে চোখ ঘোর রক্তবর্ণ হয়ে গেল।

অভিসম্পাত—থানে উঠে নাচ ! দ্যাখ তোর কী হয় ! ভস্ম হয়ে যাবি। দেবীর থান বলে কথা। লাটুকে আসল কথাটাই বলা হল না। লাটু, দেবীর অভিশাপে তোমার সব ছারেখারে যাবে। তোমার মেয়ে যে বড় ছারকপালী। দেবীর থানে উঠে ভূতের নাচ নেচেছে। মানুষ লোভী হলে, নাস্তিক হলে, মিথ্যাপরায়ণ হলে, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাজ করলে, ঝড় ভূমিকম্প, মড়ক আত্মনাশের উপসর্গ সৃষ্টি হয়। মৎস্যপুরাণে তা পরিষ্কার লেখা আছে। সামনে তোমার ঘোর বিপদ।

পঞ্চতীর্থ জানেন লাটু নিজেও নানা শাস্ত্রবিরোধী কাজে লিপ্ত। তাকে বলে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। সামনে ঘোর বিপদের কথা বলতে পারেন। তার প্রতিবিধান জানতে চাইতে পারে লাটু। এই পর্যন্ত। খুব বেশি ঘাবড়ে গেলে বলবে, যা ভাল বোঝেন করুন। ভুবনেশ্বরীকে সব খুলে বলুন। শাস্ত্রমতো সব কাজ সে করবে। আমার সময় কোথায় !

দ্যাখ লাটু থানে উঠে ঈশানী নেচেছে। দেবী চামুণ্ডা ক্ষমা করবে না। চামুণ্ডার রোষ ত্রিপুষ্কর দোষের সামিল। তার দোষে শস্য ও পুত্রহানি হয়। তিথি দোষে গরু এবং নক্ষত্র দোষে গোত্র ধ্বংস হয়। ত্রিপুষ্কর দোষে সমস্তই বিনষ্ট হয়, এমনকি বাস্তুবৃক্ষও জীবিত থাকে না।

কি উপায় কাকা ?

ত্রিপুষ্কর শান্তি করলেই সব দোষ খণ্ডন হয়ে যাব।

এই সব ভাবলে পঞ্চতীর্থের ঘোর উপস্থিত হয়। তিনি দেখতে পান দ্বাদশবৃক্ষ উড়ে চলেছে। চামুণ্ডার রক্তকেশে আকাশ নক্ষত্রমালা সব অবলুপ্ত। সেই রক্তকেশ রজ্জু হয়ে শেষে ধরণীতে নেমে আসছে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্বাদশ বৃক্ষ। মনে হল ঈশানীর গলায় সেই ফাঁস। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, দ্বাদশ বৃক্ষের সেবাইত। তার ঘোর মিথ্যা হবার নয়। জ্বলে পুড়ে মরছিলেন গতকাল থেকে। এই ঘোর উপস্থিত হলে তিনি কিছুটা নিজেকে নিস্তেজ বোধ করলেন।

এ কি দাদা, আপনি বসে আছেন, যাননি ! শরীর খারাপ লাগছে !

পঞ্চতীর্থ চোখ মেলে দেখলেন, টুকি গায়ে শাল জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারই বয়সী টুকি, বিয়ের পরই বিধবা, লাটুর বাবার আশ্রয়ে সেই কবে থেকে ছিল। এখন ভাইপোর আশ্রয়ে। বাড়ির গৃহভৃত্য বড়বংশীকে নিয়ে গাঁয়ে কেচ্ছাও কম ওড়েনি। বড়বংশী গত হবার

পর খুবই একা হয়ে গেছে বোঝা যায়। তবে দাপট কমেনি। শরীরের বাঁধুনিও বেশ শক্ত। কিছুটা উঠে বসে বললেন, এক গ্লাস জল দে টুকি। মাথাটা কেমন ঘুরে গেল !

আপনি আর উপুস কাপাস দেবেন না তো। শরীরে তো হাড় ক'খানা আছে। পিত্তশূলে ভোগছেন। হবিষান্ন ছেড়ে দিন। এই কি পূজা আর্চায় উপবাসে শরীর কাহিল করে ফেলছেন। আজকাল কি এত কেউ মানে !

যে কটা দিন আছি লেংটি খুলতে পারব না। শরীর বেশ দুর্বল বোধ করছি। কি করা ! আবার তো চামুণ্ডার থানে রুদ্রভৈরবীর আবির্ভাব তিথি আসছে। এক দু' বছর নয়—পাঁচটা বছর বাদে তিথির আবির্ভাব হচ্ছে। কি যে হবে কে জানে ! কাকে খায় কে জানে।

টুকি বলল, কিছু টের পেলেন।

বুঝতে পারছি না। যাই হোক শ্যাওড়ার ডাল, কুশ, বাঁশখণ্ড পুঁতে বাইরে বেদি করে রাখিস। যা দিনকাল, যতটা প্রতিকার সম্ভব করে রাখা। ত্রিশূল ডমরু, একখানা খড়্গ বেদিতে রক্তচন্দন মেখে রেখে দেওয়া ভাল। একটা তো রাত। সাবধানের মার নেই। কুমারী রক্তবস্ত্রও রেখে দেওয়া দরকার। এবার তো অসুবিধা হবার কথা নয়।

টুকি বুঝতে পারল, দাদা ঈশানীর কথা বলতে চাইছে। ঈশানীর কানে উঠলে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে।

সে হুঁ হাঁ কিছু বলল না।

পঞ্চতীর্থ জল খাবার আগে কপালে ঠেকালেন। রক্ত চন্দনে চর্চিত কপাল এমনিতেই কেমন একটা ভয়ের উদ্রেক করে। চোখ রক্তবর্ণ এবং কোটরাগত। চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে।

টুকি বুঝল, আর বেশিক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। বড় বেশি গিলছে।

আমি যাই দাদা।

আমিও উঠছি। লাটুকে বলবি ঈশানী একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। যাই হোক লাটুর সঙ্গে পরে কথা বলব।

আর তখন ঈশানী নতুন ডাক্তারকে এরোবিকস দেখাচ্ছে।

তুমি কি জানো ডাক্তার শরীর সচল রাখার জন্য এরোবিকস এখন একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যায়াম। এত বেলাতে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছ, ওঠো। এরোবিকস করলে ভাল ঘুম হয় জানো। মন সতেজ

থাকে। শরীরের মেদ হ্রাস হয়।

সুধাময় তক্তপোষের এক কোনায় জড়সড় হয়ে বসে আছে। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ত্রাসে পড়ে গেছে। রাতে পিচাশিতলার রাস্তায় এ কি বিষম বিভ্রমে পড়ে গেল! সে কোনও ব্যাখ্যাই খুঁজে পায়নি। কে তাকে বার বার নাক মুখ কপাল চোখ বদলে দেবার কথা বলল! সে তো তার দাদাদের পরামর্শমতো কেবল বলেছে, হবে! হবে না বললেই উপদ্রব শুরু হতে পারে। কি দরকার উপদ্রবের মুখে পড়ার। তারপর যত ভাবছে, তত মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। সে কিছু খায়ওনি আতঙ্কে। এমন অশরীরীর পাল্লায় পড়ে যেতে হবে শেষে, শরীর নিস্তেজ। কোনওরকমে সাইকেলটা তুলে রাখতে বলে সেই যে বিছানায় লেপের নিচে ঢুকে গেছে, আর মুখ বার করেনি।

আরে ডাক্তার কী হল! ঘরে ঢুকেই লেপের তলায়। মুখ বার করছ না।

গুরুপদ ঠিক খবর পাচার করে দিয়েছে। ডাক্তারবাবুর কিছু হয়েছে। হতাশ চোখ মুখ। হাত পা ধুল না, খেল না, কোনও কথা বলল না, লেপের মধ্যে ঢুকে গেল।

সে শুধু বলেছিল, আর থাকা যাবে না পণ্ডিতমশাই। কালই চলে যাচ্ছি।

কী হয়েছে বলবে তো! মুখ বার করছ না কেন?

কিছু হয়নি। গুরুপদ দরজাটা বন্ধ করে, রাতে এখানেই শুয়ে থাকবে। সকালে রওনা হয়ে যাব।

আসলে গাঁয়ের চাষীভূষোর কথা নিয়ে কোনও তোলপাড় হয় না, বড়লোকদের কেচ্ছা গরীব গুরবো মানুষের বেঁচে থাকার প্রেরণা—তাও সে বোঝে। দাবানলের মতো খবর ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। তিন-চার মাসও পার হল না, চ্যাংড়া ডাক্তার পালাচ্ছে।

ভোররাতের দিকে চোখ লেগে এসেছিল। কত বেলা হয়েছে জানে না। বাইরে গণ্ডগোল কিসের! গুরুপদ ছুটে এসে তারস্বরে ডাকাডাকি—ডক্তারবাবু উঠোন। শিগগির উঠোন। ঈশানীদি এসেছে।

সঙ্গে মনে হয় কিছু সাঙ্গপাঙ্গ।

ওদিকে থাকে।

ও-ঘরটায় থাকে।

ঈশানী মানে, সূর্যতনয়া সকালে কি চোর পাকড়াতে হাজির।

পালাচ্ছ ! গাঁয়ে ডাক্তার থাকে না। পালালেই হবে। এখানে কি মানুষ থাকে না ! ভেবেছ কি। দাঁড়াও থানায় এক্ষুনি খবর দিচ্ছি—এমন সাত পাঁচ ভেবে সে আরও বেশি ক্যালানেমার্কা হয়ে গেল। লেপে মুখ ঢেকে শক্ত হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া উপায়ও নেই। পালাবার সব রাস্তা বন্ধ করে দিতেই বোধ হয় এসেছে। এমন সুন্দর পরির মতো দেখতে মেয়েটার মাথায় যে কি আছে ! আমি যাই থাকি, পালাই—তোর কি !

সুধাময় ভেবেছিল তেড়েফুড়ে উঠবে।

ওহো নো কনফ্রন্টেশান। পড়ে থাক, মরার মতো পড়ে থাক। ক্যালানেমার্কা.হয়ে যাও। ব্যক্তিত্ব ফ্যক্তিত্ব অচল। যা হচ্ছে হোক, হতে দাও।

লেপটাকে চামড়া টেনে তোলার মতো এক ঝটকায় সরিয়ে নিল ঈশানী।

ঈশানী। অপরূপ কামিনীর চোখে মুখে দিব্য হাসি। —কি হয়েছে ডাক্তার !

কিছু হয়নি।

হয়নি তো বেলায় শুয়ে আছ কেন ?

শীত করছে।

ঠাণ্ডায় শীত করবেই। শীতের কি দোষ ! ওঠো। উঠে পড়। তুমি চলে যাবে ঠিক করেছ ?

না তো !

যাবে না তো !

আরে না।

পঞ্চতীর্থ দাদু যে বলল, চ্যাংড়া ডাক্তার পালাচ্ছে।

সে তো পণ্ডিতমশাইকে বলেছে। পঞ্চতীর্থ দাদু জানল কি করে !

না না। পঞ্চতীর্থের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কোনও কথাও হয়নি।

তা হলে কথা ওড়ে কেন ! ওঠো। কুঁড়েমি কর না। সকালে এরোবিকস করলে মন সতেজ থাকে জানো।

সুধাময় এরোবিকসের নামই শোনেনি।

সে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলে কি বুঝল কে জানে ঈশানী। তুমি না শহরের ছেলে। এরোবিকস জান না ! কিচ্ছু জান না ডাক্তার। এই দ্যাখো—

দ্যাখো বলেই আলখেল্লার মতো দামি পশমের ঢাকনাটা শরীর

থেকে খুলে ফেলল। নিচে স্কার্ট। বাদামি রঙের ঢোলা হাঁটুতক জামা! ঘরটা বড় বলে দূরে দাঁড়িয়ে বলল, এই দ্যাখো। দুটো পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়ালাম। দ্যাখো, কোমর থেকে শরীরের উপর দিকটা বাঁকানো। এবার বাঁ হাত উপরে তুলে ডান কানের পাশে ঝুলিয়ে যতটা পারা যায় ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে। যত ঝুঁকতে পারবে ততই উপকার। এ-ভাবে বাঁ দিকে দশবার, ডান দিকে দশবার। হল! এই হল এক নম্বর।

এবারে দু' নম্বর।

বলেই ঈশানী পেছন ফিরে দাঁড়াল।

সে পা বেশ ফাঁক করে দেয়ালের দিকে নুয়ে পড়তে থাকল। ঈশানীর পাছা বের হয়ে আসছে। উঠে আসছে। কতটা অশ্লীল হতে পারে ঈশানীর বোধ হয় কোনও বোধই নেই।

এবারে সামনের দিকে নুয়ে পড়া। ঠিকমতো লক্ষ করবে ডাক্তার—কি ভাবে কোমর পর্যন্ত সামনের দিকে নুয়ে পড়ছি। হাত দুটো দ্যাখো যতটা পারা যায় ছড়িয়ে দিতে হবে। সোজা থাকবে হাত। হেলবে না। এ-ভাবে পায়ের দিকে ঝুঁকতে হবে।

দু ঠ্যাঙের ফাঁকে অপরূপ কামিনীর মুখ দেখা যাচ্ছে। দুটি বিনুনি ঝুলে পড়ছে দু'-পাশে। কোমর পাছা ছাড়া, মুখ এবং লম্বমান দুটো ঠ্যাং দেখা যাচ্ছে। যত দেখছে, তত সে গুটিয়ে যাচ্ছে। বাইরে তারস্বরে কাচ্চাবাচ্চারা ঈশানীদি সার্কাস দেখাচ্ছে, ঈশানীদি ডাক্তারবাবুকে ম্যাজিক দেখাচ্ছে বলে চেঁচাচ্ছে।

ঈশানী নির্বিকার।

তিন নম্বর।

এ-ভাবে শুয়ে পড়তে হবে। মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে একটি পা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি উপরে তুলতে হবে। আস্তে, আস্তে। ঈশানী পা তুলছে।

ঈশানী পা তোলায় তার নিচের অন্তর্বাস, জংঘাস্থলে ফাঁপানো বস্তুটিও কুঞ্চিত হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে।

সুধাময়ের মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে। তাকিয়ে থাকাটাও অসভ্যতা। সে জানালার দিকে মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করল।

এই ডাক্তার! ও দিকে তাকাচ্ছ কেন! ওখানে কি মজা আছে। এই তোরা যা। যা বলছি।

এক লহমায় সব সাফ হয়ে গেল। দৌড়ে সবাই পালাচ্ছে।

তাকাও।

সুধাময় বলল, আমি দেখছি।

জানালার দিকে তাকিয়ে দেখা যায়? ওখানে বাঁশের জঙ্গল ছাড়া কিছু নেই। কি হল!

ঈশানী আজকের মতো থাক। আগে এক নম্বর, দু' নম্বর রপ্ত করি। তারপর তিন নম্বরে আসব।

আরে তোমার ভালর জন্যই দেখাচ্ছি। পরে উপকার পাবে। তাকাও বলছি।

অগত্যা তার না তাকিয়ে অন্য কোনও উপায় থাকল না।

হাত দুটো পায়ের দিকে টান টান রেখে সামনের দিকে যতটা পারা যায় ঝুঁকতে হবে। এক দুই তিন...দশ— পেটের পেশী সঙ্কোচিত ও প্রসারিত করতে হবে।

ঝিনুকের মতো উঠে আছে জায়গাটা। পেটের সঙ্কোচন প্রসারণের সঙ্গে টাইট অন্তর্বাসের অন্তর্গত খেলাও জমে গেছে। সুধাময়ের হাত পা কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। শরীরে উষ্ণতা জমছে। শ্বাসপ্রশ্বাস বিলম্বিত হচ্ছে। চোখ কেমন অলস হয়ে আসছে। সে না পেরে বলল, আমি বলছি তো যাব না। আর কত শেখাবে আমাকে!

তুমি একটা নভিস ডাক্তার। তোমার ক্যাসেট আছে—হ্যাঁ ওই তো মেলা ক্যাসেট। তুমি তো গান ভালবাসো দেখছি। কি গান দেখি—বলেই ছুটে গিয়ে একখানা ক্যাসেট তুলেই ঠোঁট বাঁকিয়ে দিল।

না হবে না। মিউজিক নেই। মিউজিকের তালে তালে এরোবিকস করতে হয়। এসগো মা লক্ষ্মী, বসগো মা লক্ষ্মী দিয়ে হয় না। কোথায় পাও এ-সব ক্যাসেট। মান্ধাতা আমলের গান—কেউ শোনে! ও দিয়ে যাই হোক এরোবিকস হয় না।

ঈশানী তার সাজানো ক্যাসেট হাতড়াচ্ছে আর ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল সাজানো ক্যাসেটগুলো। সুধাময় হাঁটু গেড়ে তুলছে, বিছানায় সাজিয়ে রাখছে। মুহূর্তে যেন প্রলয় ঘটিয়ে দিয়ে হাত ফাত নেড়ে তার পিঠে হেলান দিয়ে বসে পড়ল।

আরে এই তো সেই ঘ্রাণ চুলে। মনোরম সুগন্ধিতে ভুর ভুর করছিল। যেন একতাল সুগন্ধী খাবার। সুধাময় গন্ধটা চিনতে পারছে।

'লাইক আ ভার্জিন' নেই!

না।

'ড্রেস ইউ আপ' নেই?

না।

কি আছে তবে তোমার ? এ-সব গান তুমি শোনো কেন ?

ভাল লাগে।

ওফ আমার বমি পাচ্ছে। তুমি না, ডাক্তার ! বিচ্ছিরি রুচি তোমার দেখছি। তুমি মাস্টার সিকস প্রোগ্রাম দ্যাখো না, টপ টুয়েন্টি ভিডিও কাউন্ট ডাউন দ্যাখোনি ? আনপ্লানড জোন, স্টপলেস হিট ও হাউ ওন্ডারফুল—বলতে বলতে চোখে বোধহয় আশ্চর্য সুষমা সুযোগমতো এসে চলে যাচ্ছে। সুধাময় পিঠ সরাতে পারছে না, মুখ দেখতে পাচ্ছে না। পিঠ সরালেই পড়ে যাবে। সে কোথাকার কে, কাল সকালে দু-দণ্ডের দেখা, আর এই সকালে তার ঘরে ঢুকে তাণ্ডব—সে কিছুই মেলাতে পারছে না। তার বাবা সামান্য কেরানী, অতি কষ্টে এবং আত্মত্যাগের বিনিময়ে একটা সেকেলে টিভি, মা অসুস্থ, ছোটভাই মূক বধির—বোন চোখে কম দেখে—তার যে এ-সব শোভা পায় না কি করে বোঝায় !

সে কলকাতার রাস্তায় এই সব লাস্যময়ী তরুণীদের যে না দেখেছে তা নয়—কিন্তু এমন একটা অবচীন গ্রামে—না ভাবা যায় না। এম টি ভির খবর যে রাখে না তাও না। তবে তার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। সে বলল, আমি কিছু জানি না। সত্যি জানি না।

ডাক্তার তুমি কি সুন্দর দেখতে। আই লাইক ইয়ু ডিপার অ্যান্ড ডিপার। তোমার সব কিছুই না জানি কত সুন্দর !

সুধাময় কি বলবে ! সে শুধু সামান্য হাসল।

কাল পৃষ্ঠদেশে যিনি অবস্থান করছিলেন, তার গায়ের গন্ধ চিনে ফেলায়—সে আরও হতবাক হয়ে গেছে। এত রাতে কোথা থেকে ফিরছিল ! সেই কি ! না এও কোনো মরীচিকা। গন্ধটা তার নাকে এখনও লেগে আছে। এই লাস্যময়ী তরুণী আসায় সে সব গুলিয়ে ফেলছে। খুবই অসম্ভব ঘটনা—সে কি নিশীথচারিণী। জ্যোৎস্নায় যে দেবীর মোহ সৃষ্টি হয় হেমন্তের মাঠে—জাগালদারদের সেই অবিশ্বাস্য দেবীদর্শনের হেতু কি তিনি !

আর তখনই তড়াক করে লাফিয়ে ঈশানী তার সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল—দ্যাখো ডাক্তার আমার গালে না কি হয়েছে।

ও কিছু না।

তুমি হাত দিয়ে দ্যাখো না।

হাত দিতে নেই। ইনফেকশান হতে পারে। কী লাগিয়েছ ?

চন্দন লাগিয়েছি। তোমার কাছে কোনও অয়েনমেন্ট নেই।

আমার কি হবে ডাক্তার ! তুমি হাত দিয়ে দ্যাখো না। প্লিজ। আমি আর তোমাকে ভয় দেখাব না। কি করব আমার যে সব চাই। মোনালিসার মতো কপাল, ভেনাসের মতো থুতনি...

সুধাময় বুঝল এই নারীই কাল, অন্ধকারে তার সাইকেলের ক্যারিয়ারে লাফিয়ে উঠে গেছে। সে এতই প্রেতাত্মার ঘোরে পড়ে গেল যে, কোনও প্রশ্নই করতে পারেনি আতঙ্কে। আরোহিণী যা চেয়েছে, সবই বলেছে, হবে। আর কিছু বলতে পারেনি। জ্বর দিয়ে ঘাম ছাড়ার মতো সে খুবই হালকা হয়ে গেছে। কিছুটা স্বাভাবিকও।

এত রাতে! তোমার কি মাথায় পোকা আছে! কোথায় গেছিলে।

পিশাচিতলায়। জানো, লোকে বলে পঞ্চতীর্থ দাদু সিদ্ধ পুরুষ। তিনি ঘণ্টাকর্ণ পলাশপত্রের খবর দিলেন। রাতে ওর সঙ্গে গেলাম। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। আমার সঙ্গে তুমি থাকলে কি যে ভাল লাগত না।

লাটুবাবু যেতে দিলেন !

ওক তুলে দরজার সামনে গিয়ে বসে পড়ল ঈশানী।

কি হল !

বমি পাচ্ছে।

তারপর সে কোনওরকমে দরজা ধরে উঠে দাঁড়াল। কোনওরকমে দেয়াল ধরে ধরে তার তক্তপোষে বসে পড়ল না শুধু, শুয়েও পড়ল।

সুধাময় দেখছে, তখন কিছু কৌতূহলী চোখ। দূরে অদূরে এই ঘরটার দিকে চোখগুলির দৃষ্টি আবদ্ধ। সে সব জানালা খুলে দিল। কাছে গেল ঈশানীর। বলল, শরীর খারাপ লাগছে !

না। একদম না। এই বিছানায় তুমি শোও। রোজ। রোজ শোও। কী যে ভাল লাগছে না ভাবতে ! বিছানায় সে তার মুখ ঘসটাতে থাকল।

॥ পাঁচ ॥

বয়েস ঠিকঠাক শরীরে কামড় না বসাতেই ময়নার মাতন শুরু। সেই মাতনের জের শেষে এই বুড়ি শাউড়ি, এক দঙ্গল ছানাপোনা—আকাল ভাল মানুষের মতো শুয়ে থাকে, বসে থাকে, পয়সা হাতে থাকলে তাড়ি খায়। কোনও সকালে খ্যাপলা জাল ফেলে বাবুদের পুকুরে মাছ ধরে দেয়। দিলে সে এক ভাগ মাছ পায়,

হাটে বাজারে বিক্রি, দু-বেলা তখন পেটে দানা পড়ে।

আসলে ছোটবংশী গমের খেতে শরীরে গরম ধরিয়ে দিয়েছিল। আকাল গরমের সুযোগে বে থা করে ঘরে তুলে নিলে। সেই থেকে সে আকালের বউ। বউ হয়ে বুঝেছে, আকাল খাক না খাক, গতরের কামাই দিতে জানে না। বে'র পর শুতে বসতে যখন তখন টানাটানি। সম্বল বলতে দু বিঘে জমির চাষ। আকাল তখন খুবই জোয়ান মানুষ—মাছ মারে—জমিন থেকে শস্য ওঠে, হলে কি হবে, শাউড়ি আর তারা মিলে তিনটে পেট, বছর না ঘুরতেই চার—তারপর পাঁচ—এই চলছে। ময়না আর কি করে! এ-বাড়ি সে-বাড়ি ধান ভানে খুদকুঁড়া আনে—সুযোগ পেলে বাবুদের আলু পটল খেত থেকে এটা ওটা চুরি করে। দু-বিঘে জমি আকালের নেশা ভাঙে কবেই বে-হাত। খিদা নিবারণের এই এক উপায়। শরীরের গরমে চরম সর্বনাশের মুখে।

ছোটবংশীর পথ আগলে ময়না দাঁড়িয়েই আছে। সরছে না। লোকটার উপর আক্রোশেরও শেষ নাই। —তুমি ছোটবংশী গোলাম। তোমার শরীরে কোন মাতন নাই। তুমি লাটুবাবুর বিশ্বাসীজন, এই দেমাকেই গেইলে। তোমার গোলামি...ঘেন্না ঘেন্না। সে পারলে যেন ছোটবংশীর মুখে থু দেয়।

ছোটবংশী কিছুটা হতাশ। পথ ছাড়ছে না। কে কখন দেখে ফেলবে! অবুঝ। সে তাকে ঠেলে সরিয়েও দিতে পারছে না। অপমান! গায়ে হাত। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। চিল্লাচিল্লি করলেই সে গেছে।

ময়না রাস্তা ছাড় বলছি। খুবই সংকট সামনে ময়না।

সংকট কেনে দাদা?

জমি থেইকে ধানের ছড়া হাওয়া। বলি পোকামাকড়ে খায়—বাবুর বিশ্বাস হয় না। বলে মনুষ্যে খায়।

ময়না ঠেস দিয়ে বলল, ধান ইঁদুরে খায় দাদা। ইঁদুরে খেলে সহ্য হয়, মানুষে খেলে বুঝি সহ্য হয় না!

তা জানি না। গাছের মাথায় ছড়া থাকে না। ছড়া কেটে লিলে যা হয়, গাছ সোজা ডাঁড়িয়ে যায়। সারা জমিনে ধানের কাঠি দেখে বাবুর মাথা গরম। ধরে দিতে পারলে বাবুর মাথা ঠাণ্ডা হবে। খুব চোটপাট চলছে। ডেকে হম্বিতম্বি, শালোর বেটারা জাগাল দেয় না, ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়। ধরতে পারলে হাজতবাস—নেমকহারামের দল!

ময়না আর দাঁড়ায় না। কাঠাখানা মাথায় নিয়ে হাঁটা দেয়। যাবার সময় না বলে পারে না, তা দু'-একখানা কাঠি ডাঁড়িয়ে কর্তার পাছায় ঘা করে দিলে দাদা। সব কাঠি ডাঁড়িয়ে গেলে কী হবে!

আসলে ময়না নিজেই তরাসে পড়ে গেছে। বাবু টের পেয়ে গেছে—ধানের ছড়া চুরি যায়। কে সেই ধান্যচোর!

গভীর রাতে কাঁখে কাঠা, হাতে শামুকের খোল, কট করে ছড়া কেটে জমির মধ্যে তার লুকোচুরি। জাগালদারদের চোখে না পড়ে—জ্যোৎস্নায় এ-তার এক নেশার মতো—আকাল তখন বারান্দায় বসে থাকে। আকাল সঙ্গে আসে না কখনও। এলেও গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। ঘাপটি মেরে থাকে। ময়না ধানের ছড়া তুলতে গিয়ে মাঠের জোছনায় কী লীলাখেলা করে কে জানে? বউ বের হলে আকালও পিছু পিছু গোপনে কিছুটা যায়—কিন্তু বেশিদূর যেতে সাহসে কুলায় না। পিচাশিতলা বড় আতঙ্ক তার। তার বাপ দেড়যুগ আগে পিচাশিতলায় গলা দিয়েছে। তারপর গেল সুধন্যর বউ, জরার বাপ। এ-সালে আবার কার পালা কে জানে!

বাড়ি ঢুকে ময়না দেখল, ঘর অন্ধকার। বারান্দায় কিছু ভুতুড়ে ছায়া, জড়াজড়ি করে বসে আছে।

বুড়ি শাউড়ি একপাশে ছেঁড়া মাদুরে, কেঁথা গায়ে ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছে। আজ চিল্লাচ্ছে না। সারাদিন পেটে না পড়লে বাড়ি মাথায় করে হল্লা জুড়ে দেয়। ভেউ ভেউ করে কাঁদে। খেতে দিলে পাত ছেড়ে উঠতে চায় না! আর দু' হাতা দ্যা বউ। সোনাধন, মানিকধন আমার। দ্যা না বউ। আমার সোয়ামীর বাড়ি, পেটে না ধরলে পেতিস কোথা আকালকে। তর শরীরের গরম ঠাণ্ডা করতে ব্যাটা আমার হাড় ক'খানা সার কইরে বইসে আছে।

সেই শাউড়ি হল্লা করছে না, এখনও শুয়ে আছে দেখে তাজ্জব। ডেঁড়িকুপি জ্বেলে বারান্দায় কাঠাখান উপুড় করে দিতেই মুক্তোর মতো চালের দানা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে তুষের উপর ঝুঁকে পড়তেই ঠেলে সরিয়ে দিল ময়না। ভুতুড়ে ছায়াগুলি লম্ফের আলোতে যেন তাজা হয়ে গেল। তারাও গোল হয়ে বসে গেছে।

কত কাজ ময়নার। ছুটকি দৌড়ে গিয়ে মাচানের নিচ থেকে কুলাখান এনে মাকে সাহায্য করছে। বুড়ি আনন্দে মাথা দোলাচ্ছে।

একটু সাঁজ না লাগলে ময়না কাজটা সারতে পারে না।

লাটুবাবুর পিসি ঢেঁকির চাল আল্টে দেয়। পিসির চোখে ধোঁকা

দিয়ে চাল গায়েব করার ফন্দি তার জানা। সে খুদকুঁড়ার সঙ্গে অতি কৌশলে কেজিখানেক চাল সহজেই তুষের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। তার সুনাম কম। তার স্বভাব ভাল না। তবে সে অসুরের মতো খাটতে পারে। এই একটা সুনাম আছে তার। এক কাজে গেলে, নানা কাজ তুলে দিয়ে আসে। শুধু শরীরে সেই যে গরম ধরিয়ে দিয়েছিল ছোটবংশী—সুদে আসলে মাটিতে ফেলে তাই এখন আছড়াচ্ছে। গরমের খেসারত যারে কয়।

সেই গরম ছোটবংশী টের পেল না, আকাল টের পেয়ে ঘরে তুলে নিল। সেই গরমে এই হাল। মানুষের মধ্যে এই গরমটা না থাকলে সে ঝাড়া হাত পা থাকত। মাঝে মাঝে কাজ কাম না থাকলে ঘরের দাওয়ায় বসে থাকলে এমন মনে হয় তার। সে তখন আকালের গুষ্টিসুদ্ধু গাল পাড়ে। বড়টা নেই। মাইজাটাও উড়ছে। এই আছে, এই নেই।

ওরে কাঙ্গাল তু কুথি গ্যালি। কুথি মরতে গেলিরে বাপ। কুয়োর জল লিয়ে এয়েছিস ? না খালি সব !

কাঙ্গাল বাড়ি থাকতে চায় না। ফিরে এসেও দেখেনি—বড়টার সঙ্গে উড়ছে। বাড়ি না ফিরলে বোঝে সে আজ আর ফিরবে না। নিমতলার চা-এর দোকানে কাপ প্লেট ধুয়ে হয়ত পয়সা পেয়েছে, বাপ কেড়ে না নেয় সেই আতঙ্কে পালিয়ে বেড়াতে পারে।

ছুটকি বলল, দাদা ফেরেনি মা। জল তুইলে রেখেছি।

বড়টা তো কবেই উড়তে শিখেছে। হাতে পাচন নিয়ে এখন ছোটবংশীর মতো মাঠে গরু চরাতে যায় বাবুদের। মোষের পিঠে বসে হটর হটর করে। বাড়ি ফেরে ইচ্ছে হলে, না হলে ফেরে না। লাটুবাবুর মহালে গরুমোষের খাটালে খড়ের উপর শুয়ে থাকতে ভালবাসে। একদিন সে তার গানও শুনেছে—বড় ব্যাটা গাইছে, আঁধার রেইতে চকমকি আগুনে পুড়ে মরি সইলো সই।

এক গরম থেকে আর এক গরম। গানটা শুনে কপালে হাত—বলে কি সই লো সই ? সই-এর কিছু বুঝ আছে তুর। সেদিন না তু আমার পেট থেইকে খসে পড়লি !

নতুন ধানের চাল, তার ঘেরানই আলাদা।

সব এগুি গেণ্ডি, বুড়ি শাউড়ি চালের ঘেরানে তাজা। দু একটা দানা মুখেও ফেলে দিচ্ছে। ঘুরপাক খাচ্ছে, নাচছে। মচ্ছব বাড়িতে। বুড়ি শাউড়ি উবু হয়ে দেখে আর তুষ তুলে দেয় ময়নার কুলোতে।

এখন তুষ ঝেড়ে চাল, খুদ আলগা করার কাজ তার। তুষের জায়গায় তুষ, খুদের ঘড়ায় খুদ, আর টিনের কলাই করা বাটিতে চাল। বাড়ি ঢোকার মুখে ছুটকি পাহারায়। সে নজর দেবে, যদি কেউ রাতে দেখতে আসে—কে জানে, ওরে কাঠাখান নিয়ে গেল আকালের বউ। যাও যাও কাঠাখান লিয়ে এইস। সে কাঠাটা কাল ফেরত দেবে এমন কথা আছে, কথা থাকে, কে জানে তবু মানুষের মন তো! স্বভাব ভাল না বলে কাঠার অজুহাতে চলে আসতে পারে।

ও আকালের বউ তুষ তুলে রাখলি? কাঠাখান দে। সকালে বাজারে যাবে উদাসী।

দরকার না থাকলেও কোনো অজুহাতে ময়নার হাত সাফাই হাতে নাতে ধরতে চলে আসতে পারে।

আসলে চোরের মন তো।

বড় তাড়াতাড়ি তাকে কাজ সারতে হয়। মসজিদের কুয়ো থেকে জল তুলে ঘড়া সব ভরে রেখেছে ছুটকি। কাঙ্গালের বাপ বারান্দায় এক ট্যারে জায়গায় বসে বিড়ি ফুঁকছিল। আর আড়চোখে দেখছিল তাকে। বউ আবার পোয়াতি হয়েছে এটা বড়ই সুলক্ষণ। সে ধরায় নিজেই একটা বসতি গড়ে দিতে পারছে এটাও কম সুখের কথা না। তার ক্ষমতার জোর আছে সে বোঝে।

তবে আকাল কথা বলছিল না। কী মেজাজ কে জানে! দুপুরে বের হয়ে গেছে—এই এল সাঁজ বেলায়। ছেঁড়া জালখানা তাপ্পি মারছিল বসে। সেও বসে নেই। নিষ্কর্মা মানুষ এই এক চোপার ভয়ে সে যেখানে যা পায় তুলে আনে। গরুটা দুধ দিলে তার হম্বিতম্বি বাড়ে। দুধ বেইচে পয়সা।

এবারে শালো মা ভগবতীর বাঁটে ঠাঠা পড়েছে। বাঁটে হাত দেওয়াই যায় না। ভন ভন করে মাছি উড়ে বেড়ায়। তবে বাঁটে ঠাঠা পড়লে হবে কি হারামির—এর ওর জমিতে মুখ দেবার স্বভাব। ঠাকুর পঞ্চতীর্থ থানের জল দিয়েছে। এক আশা কুহকিনী—জলে ঘা সারলে আবার দুধ হবে। দুধ হউক না হউক এই একটা কাজ আছে বলেই ময়নার চোপার ধার সে ধারে না।

ধারে না বললে ঠিক না, ময়না দশটা গাল দিলে, সে অন্তত একবার দানবের মতো ফুঁসে উঠতে পারে।

শালি হারামজাদি, তুই কি ভেবেছিস! গতরে তর গরম ধইরেছে। গরম তর বের করছি! সাপের পাঁচ পা দেইখে লিয়েছিস। ছেনাল

মাগির মুখে আবার বড় বড় কথা ! বেশি চোপা করবি ত তুর বোড়াতে মুড়ো ঠেইসে দেব ।

আমি ছেনাল আছি ত বেশ কইরেছি। করবেটা আমার কচু। ছেনাল আমারে কে বানিয়েছে! গম খেতে কে আমারে জাপটে ধরেছিল। বোড়াতে মুড়া ঠেসে ধরবে ! পারিস কি না দ্যাখ না ! তুর শালা পা খোঁড়া করে না দিচ্ছি ত আমি হারামের বাচ্চা।

শাউড়ি বেটির তখন কি কথা !

মেলা বকিস না বাপধন। সব গরমের জের। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব গরমের জের বাচাধন। তরে গরমে খায়, বৌরে খায়—আমার গরমে তুই—একটা না দুটা না, সব গরমে হয়।

কিন্তু এই বেলায় সবাই চুপ। চালের গন্ধে সবাই ভালমানুষ। সেও খুব খুশি। পাতে আজ ভাত বেড়ে দিতে পারবে।

ময়না আকালের দিকে তাকিয়ে বলল, গরুটার দড়ি জুড়েছ !

আকাল খুবই নিরুত্তাপ গলায় বলল, জুড়ব।

ঠাকুরের কাছে গেছিলে ! ঠাকুর যে বলল তোমার রাজযোগ আছে—তার খবর কতদূর !

পঞ্চতীর্থ আজকাল তাকে খুব খাতির করছে। দেখা হলেই খুশি হয়ে নেশার পয়সা পর্যন্ত দেয়। থানের বৈকালি প্রসাদ খাওয়ায়। খেলেই শরীর কেমন ঝিম ধরে যায়। কত গুহ্য কথা বলে। সে মাথা দোলায় আর শোনে।

বুঝলি বাপ ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলে গেছেন।

খুবই উচ্চমার্গের কথা বলেন ঠাকুর পঞ্চতীর্থ।

আত্মা কি ও কেন তার কথাও বলেন। সে বুঁদ হয়ে যায় শুনতে শুনতে। আত্মার সঙ্গে ঠাকুরের কথাবার্তাও হয়। আত্মা নাকি পরমাত্মার অংশ—কত গুহ্য কথা বলে—কেন জন্মালি বাপ, কোথায় যাবি শেষে, বোঝ আছে ?

সে মাথা দোলায়, আজ্ঞে না।

নে আর এক খণ্ড খিরের মালপোয়া।

ঠাকুর নিজে তৈরি করেন, তাম্রপাত্রে ঘষে বিশুদ্ধ ঘাস পাতার রসে এবং ছানার সঙ্গে আশ্চর্য সুবাস তৈরি হয়। বাড়ির কেউ তখন কাছে থাকতে পায় না। শুদ্ধ বস্ত্রে ইষ্ট নাম জপ করে ছানার কড়াপাকে বসতে হয়। সবই শোনা ঠাকুরের কাছে। বিশেষ বিশেষ তিথিতে এই প্রসাদ তৈরি হয়। দেবী গ্রহণ করলেই তিনি তুষ্ট। কিছুটা রেখে

দেওয়া। আহ্নিক সেরে পিচাশিতলা থেকে ফেরার সময় দেবীর উচ্ছিষ্টটুকু সঙ্গে আনেন। আধসের খাঁটি দুধ সেবন, তারপর সিদ্ধির প্রসাদ। সারা রাত ব্যোম হয়ে থাকেন। এসব গুহ্য কথা ঠাকুর তাকেই আজকাল মন্দিরের সামনে বসিয়ে জপাচ্ছে।

বুঝলি আকাল, দেবী হলেন প্রেমময়। আমি মরব, কিন্তু আমার প্রেম মরবে না। প্রেমময়ের মধ্যে আমার নতুন জীবনের শুরু। আমার পুনর্জন্ম। তখন আমার ইচ্ছা, স্মৃতি, আনন্দ সবই দেবীর ইচ্ছে।

সে কিছুই বুঝতে পারে না। তবু মাথা দোলায়।

ঠাকুরের এই গুহ্য কথা কাউকে বলাও যায় না। বললে পাপে তাপে ছারেখারে যেতে হয়। গুহ্যকথা যে কয় আর যে শোনে তারই আছে হজম করার ন্যায্য অধিকার। দশকান হলে মন্ত্রগুণ বিনাশ হয়— আকাল তা ভালই জানে।

ব্রহ্ম সৃষ্টি হয়েছেন, সৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করেছেন, সৃষ্টিকে ব্যাপ্ত করে আছেন আবার উর্ধ্বেও বিরাজ করছেন, বুঝলি কিছু?

আজ্ঞে না ঠাকুর।

ভাঙা মন্দিরে প্রদীপ জ্বলছে। বাইরে খোলা আকাশের নিচে দেবী চামুণ্ডার থান। দুটো করবী ফুলের গাছ, গুলঞ্চ ফুলের গাছ পাঁচিলের গেটের সামনে। পাঁচিল বেষ্টিত মন্দিরের এক দিকে ধুতুরার জঙ্গল। কিছু রক্তজবার গাছ। জোনাকিপোকার ওড়াউড়ি। যত্র তত্র ছড়িয়ে আছে চালাঘর। ডাকিনী যোগিনী থেকে ওলাওঠার দেবীরা চালাঘরের নিচে। হাত খসে পড়েছে কোনোটার। কোনোটার মুণ্ডু আলগা হয়ে গেছে। মেলা শুরু হবার আগেই এই সব খড়কুটোর দেবী বিসর্জন যাবে। হরিহর আচার্য নতুন সব দেবদেবীর প্রতিমা তৈরি করে দিলে ঠাকুর আবার তাদের মন্ত্রপাঠ করে চক্ষুদান করবে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে। ঠাকুরের এই লীলার কথা তার জানা আছে। ঠাকুরের কাছে করজোড়ে বসে প্রার্থনা করারও অধিকার ছিল না—দশ হাত দূর থেকে গড় হতে পারলেই মনে হত মোক্ষ লাভ—সেই ঠাকুর এবার তার উপর খুবই প্রসন্ন।

রাতে পিচাশিতলায় যাস। কথা আছে। ভয় পাবি না। আমি থাকব।

ঠাকুরের অগম্য জায়গা থাকতে পারে না সে বোঝে। দ্বাদশ বৃক্ষের নীচে তিনি রাত দুপুরেও জপতপ করতে বসে যান। আমি থাকব বলায় কিঞ্চিত সাহস সঞ্চার হয়েছিল তার। তবে বেশিদূর

যেতে পারেনি—অন্ধকারে গা ছম ছম করে উঠতেই ঠাকুর তার পাশে হাজির।

আয়।

ঠাকুর তার সামনে হাজির। আর ভয় থাকার কথা নয়। সে ঠাকুরকে সহজেই অনুসরণ করতে পেরেছিল।

ঠাকুর মন্দিরের দরজা খুলে কিছু আশীর্বাদী ফুল বেলপাতা তার হাতে দিলেন। মন্দিরে করালবদনা চামুণ্ডার চোখ দুটো যেন জ্বলছে। ধূপদীপাধার, তাম্রপত্র, ফুলের সাজি এবং পায়ের কাছে পেতলের ঘট। মেলার পুণ্যার্থীরা থানে মানত সেরে দেবীদর্শন করতে পারে ঠিক, তবে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেই মন্দিরে তার প্রবেশ অবাধ—কারণ তাকে ঠাকুর এবার খুবই সুনজরে দেখতে শুরু করেছেন। ঠাকুর তার আসনের পাশেই বসার জায়গা করে দিয়ে মন্ত্রপাঠে মগ্ন হয়ে গেলেন। তারপরই চোখ খুলে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোর সুসময় আসছে। রাজযোগ আছে কপালে। তোর আর কোনো কষ্ট থাকবে না। দেবী চামুণ্ডার বরাভয় এবার তোর উপর বর্তেছে।

মন্দির এবং পাঁচিল সংলগ্ন দ্বাদশ বৃক্ষের নিচে এসে ঠাকুরের কি মতি হল কে জানে। বললেন, যোগ উপস্থিত হলে ডেকে পাঠাব। আর কোনো প্রশ্ন করবি না। পিচাশিতলায় রাতে তোকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম—ঘুণাক্ষরেও এ-কথা যেন প্রকাশ না পায়। প্রকাশ পেলে দ্বাদশ বৃক্ষের কোপে পড়ে যাবি। দেবী চামুণ্ডা তোকে রক্ষা করবে না।

বলবে না, বলবে না ভেবেও শেষ পর্যন্ত ময়নাকে তড়পে গিয়েছিল একদিন। আর ফস করে মুখ থেকে বেরও হয়ে গেছিল, দেবীর বরাভয় বুঝলি, সোজা কথা না। রাজযোগ—সোজা কথা না।

তারপরই জিভে কামড়।

তারপরই ময়না ধরে রেখেছে কথাখান—কি হল! ডেকে পাঠাল।

সময় হয়নি।

আর হবে! সময় আর হবে না। ঠাকুর বলেছে—তাঁর আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই—লেনছুইরা মানুষ তুমি বোঝ?

সে আর রা করেনি।

যোগ উপস্থিত না হলে ঠাকুরই বা কি করবেন। তার শিষ্যসেবক

তো কম নেই। তিনি খড়ম পায়ে পট্টবস্ত্র পরে বৃক্ষতলে যান। বৃক্ষতলে বসেন, মেলার শেষদিনে তাঁর ভাবসমাধি হয়। লাবড়া খিচুরি পায়েস লপ্তে বসে খাওয়া।

আকালের তখন্ দম ফেলার সময় থাকে না। সারাদিন কাঠ চেলা করার কাজ তার। রান্নার মণ্ডপে কাঠ পৌঁছে দেবার কাজ তার। গুষ্ঠিশুদ্ধু পড়ে থাকে মেলায়। খাও, মচ্ছব কর, মেলায় ঘুরে বেড়াও। ময়নাও মসলা বাটার কাজ করতে পায়। কটা দিন কোথা দিয়ে যে পার হয়ে যায়।

রাজযোগের কথা উঠতেই আকাল ফাঁপড়ে পড়ে যায়। সে শুধু বলল, সবই ঠাকুরের ইচ্ছে। সময় হলে সব হয়।

ছুটকি, বড়কি উনুনের চারপাশে গোল হয়ে বসে। গায়ে কারো খুট, কারো ছেঁড়া জামা পায়জামা। আগুন জ্বলে উঠলেই উত্তাপ। ময়না, সংসারের মা জননী শুধু এখন আহারের বন্দোবস্ত করছে না—উত্তাপেরও। শাউড়ি বুড়িও আর বারান্দায় বসে থাকতে পারছে না।

আগুনের টান বড় টান।

আঘুন মাসের শীত—ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস সারাদিন। হড়কা হাওয়ার জোর কমে আসছে। আকাশ কাঁসার বাসনের মতো ঝকমকে। আকাশের তারারা সব কুরচি ফুল হয়ে ফুটে আছে। গভীর এক নিরঞ্জনের মতো চারপাশে বিষাদ। এরই মধ্যে ময়না ফুঁ দিয়ে খড়কুটোয় আগুন জ্বালিয়ে দিলে মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষণ প্রকট। টাল হয়ে আছে সব। খোলা আকাশের নিচে হাতগুলি শীর্ণকায় ধূসর মোমবাতির মতো। জ্বলে ওঠার জন্য তাপের দিকে তারা এগোচ্ছে।

ভিজা খড়কুটো থেকে ধোঁয়া, চোখে ময়না দেখতে পাচ্ছে না। বড়কি ছুটকি মঙ্গলা চোখ বুজে আছে। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে। হাড়িতে জল। পাশে কলাই করা থালায় কলমি শাক। এক টুকরো রসুন কুচি করা পাশে। একটা শুকনো লংকা। আর শিশিতে পঞ্চাশ পয়সার তেল।

বুড়ি শাউড়ি খুশির চোটে কোচরে গোপন করা তিনটে প্যাস্তা ফল ময়নার পায়ের কাছে ঢেলে দিল।

ময়না চোখ বাঁকিয়ে বুড়িকে দেখল। কার গাছ থেকে চুরি করে এনেছে কে জানে। চাল না আনতে পারলে রাতে চুরি করে তুষের আগুনে প্যাস্তা পুড়িয়ে খেত। গোপনে কেঁথার নিচে কাজটি সেরে ফেলত। কেউ টের পেলেই মরণ। আকালের ছানাপোনা ঘিরে

ধরবে। —দে বুড়ি দে। আমারে। আর ইটটু দে। দে ঠাকমা দে। বুড়ির কাছ্ থেকে কেড়ে কুড়ে সর্বস্বান্ত না করা পর্যন্ত ছাড়বে না।

জ্বালা কি বুড়ি শাউড়ির একটা—ময়না তো সব বোঝে। আলসের আগুনে প্যাস্তা পুড়িয়ে খেলেও মধুর গন্ধ। যত রাতই হোক—বুড়ির ঘর থেকে গন্ধ বের হলেই নাক টানা—সঙ্গে সঙ্গে ছুট। বুড়ি যে আড়ালে অন্ধকারে ঘরের কোণে প্যাস্তা পুড়িয়ে খাচ্ছে টের পেয়ে যায় সবাই।

এ-বাড়ির নিয়মই এই।

যে যার মতো কুড়িয়ে বাড়িয়ে খাও।

কে কোথায় খেল, কি খেল আকালের যেমন সময় হয় না দেখার, ময়নারও তেমনি। তারা এ-জন্য ভাবে না। পোকা মাকড়ের মতো জীবন। সকাল হলে পোকা মাকড় খাবারের খোঁজে বের হয়ে পড়ে, খোঁজে, খুঁজে পেয়ে যায় তেমনি কাঙ্গাল বড়কি ছুটকি মঙ্গলা যে যার মতো যায়, খুঁজে কিছু না কিছু পেয়ে যায়।

কাঙ্গাল বড় দুরন্ত। সে কোথা থেকে কখন কি আনবে কেউ জানে না। একেবারে খালি হাতে সে কখনও ফেরে না। অন্তত বাড়ি ফেরার সময় কিছু না পাক এক খাবলা গোবর হলেও সে কুড়িয়ে আনবে। জমির ঢেঁড়স, পুই ডাঁটা কাচা চিবিয়ে খায়। খেতে মজা পায়। ছুটকিকে খাওয়ায়। না পেলে জবাফুলের কুঁড়ি চিবিয়ে খায়। তিল ফুলের মধু চুষে খায়, ছুটকিকে খাওয়ায়। বেশি থাকলে মা আবাগির জন্য নিয়ে আসে।

বুড়ি শাউড়িও সকাল হলে ঘরে থাকে না। কচু কদুর বনে ঘুরে বেড়ায়। সুযোগ পেলে এক আঁটি পাটকাঠি চুরি করে নিয়ে আসে।

আগুনের বড় দরকার।

বারান্দায় আকাল বসে আছে। টালে হাত পা অবশ। ডেঁড়িকুপিটা আখার পাড়ে। অন্ধকারে মশা তাড়াচ্ছে গামছায়। আখার পাড়ে গিয়ে বসতে সাহস পাচ্ছে না।

বউর মন্দ স্বভাব সে জানে। কি নিয়ে কখন চোপা শুরু হবে তারও ঠিক নেই। তাকে দেখলেই কেন যে কুরুক্ষেত্র শুরু করে দেয় বোঝে না। স্বভাব মন্দ না হলে গামছা খুলে সব ছোটবংশীরে দেখায়!

তবে ছোটবংশীর ইজ্জত আছে। খুলে দেখালেই দেখবে কেন! বিপদে আপদে দু পাঁচটাকা ধারও দেয়। খেতের পটল বেগুন সুযোগ

পেলে বারান্দায় রেখে যায়। তার ইজ্জতে লাগে। লাগলে কি হবে ময়নার চোপার ডরে কিছু বলতে পারে না। ময়নার এক কথা, নিষ্কর্মা মানুষের এত তেজ ভাল না। যে যেটা দেয় নিতে হয়।

তা সে নেয়। কিছু বলে না। কিছু বলে না বলেই সংসার ভেইসে যাচ্ছে না। ময়না সব ঠিকঠাক আগলে রাখছে।

আগুন ক্রমে চারপাশের অন্ধকার গিলে খেতে থাকলেই সে দেখতে পেল এক হা-অন্নের ছবি। তার বুড়িমা, চারটে বাচ্চার মুখ দেখা যাচ্ছে। কী এক উদগ্র বাসনা খাওয়ার—কেউ নড়ছে না—হাঁড়ির মুখের কাছে সব ক'জন উবু হয়ে বসে আছে। হাঁড়িতে তাদের পরমায়ু ফুটছে।

আকাল আর লোভ সামলাতে পারছে না। সেও আখার পাড়ে গিয়ে বসল। আগুনে হাত মেলে দিল। আখার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আগুনে ময়নার চোখ দুটো টল টল করছে। কোনো ক্লান্তি নেই— তরতাজা যুবতী। বউর দিকে আকাল তাকাতে পারছে না। তাকালেই শরীরে গরম ধরে যাচ্ছে।

আগুন আরও উস্কে দেবার জন্য ময়না বেশি করে তুষ ছিটিয়ে দিচ্ছে উনুনে। ভাত টগবগ করে ফুটছে। ভাতের সোদা গন্ধে মঁ মঁ করছে সারা উঠোন।

আকাল কিছু বলছে না। সে আছে পরমায়ুর আশায়। কলাই করা থালায় কখন ময়না পরমায়ু বেড়ে দেবে।

সে বলল, থালা ক'খানা দে। জলে ধুয়ে রাখি।

ময়না চোখ তুলে দেখল। সাড়া দিল না। তার মন পড়ে আছে ধানের জমিতে। কতক্ষণে সে বের হবে। ছোটবংশী জাগালদার—সে এক কাঠা ধানের ছড়া শামুকখোলে সহজেই তুলে আনতে পারবে। ধরা পড়লে ছোটবংশীর খিস্তিখেউড়—এই পর্যন্ত। তার বেশি না। গতর উপুড় করে দিলে, বলবে, পাপ হবে। তুই যা। কাঠাখান এসে পরে বাড়িও পৌঁছে দিতে পারে। ছোটবংশীকে নিয়ে এই এক মজা আছে তার। ছোটবংশী ফাঁপড়ে পড়ে গেলেই তার কেন যে খিল খিল করে হাসি পায়। ভাবতেই সত্যি সে হেসে ফেলল।

আকাল বলল, বউ তু যে বড় হাসলি!

হাঁটুর উপর থুতনি রেখে ময়না আগুনে তুষ দিচ্ছে। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। আকালের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে করছে না। শরীর কি চরম বস্তু ময়নার চোখ দেখলে টের পায় আকাল। যেন

ময়না নিজেও আগুন হয়ে আছে।

আকাল বলল, ফ্যান ফেইলে দেইস না।

ফেলা হয়ও না। তবু কেন যে আকাল কথাটা বলল। ফ্যান ময়না নিজের জন্য আলাদা রেখে দেয়।

ফ্যানের সঙ্গে কিছুটা ভাত।

আজ বুঝি ময়নার সুখ উপচে পড়ছে। আকালের দিকে তাকিয়ে বলল, বাটি নিয়ে এইস।

বাটি এনে দিলে ময়না ফ্যান ভাগে ভাগে রাখল। গরম ভাত, সেদ্ধ প্যাস্তা আর সরষে বাটা। রসুন সম্ভারে কলমি শাক।

থালায় থালায় ভাত আর কলমি শাক ওজন করে বেড়ে দিল ময়না। যা দিল তাই। ফের চাইবার নিয়ম নেই। ময়না এই ঠাণ্ডাতেও ঘামছে। হাঁড়ির ভাত উল্টেপাল্টে যখন বুঝল, তার হিস্যা ঠিকই আছে তখন এক বাটি ফ্যান আকালকে এগিয়ে দিল। ফ্যানটা হলগে উপরি ভোজ।

আজ আকালের কপালে আর বুড়ি শাউড়ির কপালে জুটেছে। ছুটকি বড়কিও কিছুটা।

আকালের ভেতর ডুগডুগি বাজছে। অনাহারে অর্ধাহারে পোকামাকড়ের মতো বাঁচার কথা আকালের আর মনে থাকে না। ময়নার চোখে সামান্য রঙ্গ ফুটে উঠতেই শরীর বেহাল। বুঝতে পারছে বউর শরীরে গরম ধরে গেছে। তার শরীরেও। রোজ কেন, মাসে দু-মাসেও ময়নার চোখে এত রঙ্গ ফুটে ওঠে না।

ময়না কতক্ষণে খাবে, কতক্ষণে শোবে সেই আশায় সে তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে ফেলতে থাকল। গোয়ালে গরুটা তুলে বেঁধে দিল। এক ঘড়া জল তুলে আনল পাশের গর্ত থেকে। রাত বিরাতে দরকারে লাগে। মাচানে ছেঁড়া কাঁথা মাদুর খড়ের আঁটি-সব বিছিয়ে দিতে থাকল। ছেঁড়া মশারি টানিয়ে পঙ্গপালের মতো সব কটাকে ঢুকিয়ে দিতে পারলেই, সে আর ময়না নিচে লেপ্টে পড়ে থাকতে পারবে।

ময়নার সব কাজ এগিয়ে রাখছে। ময়নার আলাদা বিছানা—ছুটকিকে নিয়ে আলাদা শোয়। আকালের সঙ্গে শোয় না। একা মেঝেতে ছুটকিকে নিয়ে পড়ে থাকে। সে, কাঙ্গাল, মঙ্গলা আর বড়কি শোয় মাচানে। আজ উত্তুরের হাওয়া সকাল থেকে। ছুটকিকে মাচানে তুলে দিয়ে আকাল মশারির মধ্যে ঢুকে যাবার জায়গা করে রাখল।

তারপর বারান্দায় এসে লুঙ্গি নামিয়ে বসল। দাঁত খুটছে। অপেক্ষা—কতক্ষণে ময়নার আহারপর্ব শেষ হবে।

আবার মনে পড়ে গেল, ময়নার আরও কাজ বাকি। আলসেতে আগুন তোলা হয়নি।

আকাল মাটির হাতা খুঁজল। পেল না।

সে ডাকল, বউ।

ময়না খাচ্ছে। ঢকঢক করে জল খাচ্ছে।

সে আবার ডাকল, বউ শুনতে পেছিস!

কী শুনব!

আগুন তোলার হাতাখানা কোনখানে?

আমি তুলে রাখব। তুমি ঘুম যাওগে।

আরে হাতাখানা কুথি কবিত!

দেইখতে হবে।

জানিস না?

মনে নাই।

অগত্যা আকাল আর কি করে! বারান্দায়, ঘরের মাচানের নিচে, বস্তার নিচে, কাঠার নিচে খুঁজল। কিন্তু পেল না। বলল, কুথি রাখলি? কোথাও খুঁজে পেছি না।

ময়না উঠোনে আখার পাড়ে বসে আগুনের ওমে খাচ্ছে। সামনে জ্বলছে ডেঁড়িকুপিখানা। খেতে খেতেই বলল, আমি তুইলে রাখব।

আকালের মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। শরীরে যুস এসে গেছে—এখন কি আর দেরি সয়? আগুন আলসেতে তুলে রাখলেও সময় বাঁচত। তার ব্রহ্মতালু জ্বলছে গরমে। আর কি না হারামজাদি হাতা নিয়ে টালবাহানা শুরু করে দিয়েছে। শরীর কত সয়? সে আলসেয় তুস ভরে আখার পাড়ে দাঁড়িয়ে বলল, কুথি রাখলি আগুনের হাতাটা! কী টাল!

ময়না কথা বলছে না। আখার পাড়ে বসে বড় নির্বিঘ্ন মনে খাচ্ছে। আখার গরমে তার শরীর টাল হতে পারছে না। কিন্তু আকালের হাত পা ঠাণ্ডা বরফ।

মেজাজ গরম আকালের। খিস্তিখেউর শুরু হয়ে যেত—আগুনের হাতাটা পেটের নিচে লুকিয়ে রেখে শালি মজা করছে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। রঙ্গরস সব তবে যাবে। সে দু পা ছড়িয়ে লুঙ্গি তুলে আখার পাড়ে বসে পড়ল। মিষ্টি কথা বউর সঙ্গে কিংবা রঙ্গ রসিকতা।

অরে বউ আইজ যা দ্যাখলাম না...

কি দ্যাখলা।

লাটুবাবু মীরার...

তুমি দ্যাখলা! জঙ্গলে ওনাগ কাণ্ড হয় না। ঘরেই হয়। তুমি দ্যাখলা কি কইরে?

ঠিক দেখি নাই, হারু রাস্তায় বগল বাজায়ে বুলছে।

অঃ। ময়না আঙুল চাটছে।

তা মীরার সঙ্গে লাটুবাবুর লাগ আছে।

মীরা বাবুর বাড়িতেই বড় হয়েছে। মীরার মা লাটুবাবুর গোলা সামলাত। মীরা পেটে এইল। আজিজুর বাইরের কাজের লোক—দোষ ঘাড়ে চাপল তার। লাটুবাবুর বাপ অরে দেশ ছাড়া কইরে ছাড়ল। এই এক খানা মজা আছে গাঁয়ে বাস করার। ময়না এমন কত উড়ো খবরের সাক্ষী। মীরা যায় কোথায়! লাটুবাবুই হারুর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ঘরে রেইখে দিল। ঈশানীদির সঙ্গে শহরের ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে। দেশে এলে সঙ্গে আসে।

ছোট বংশী বলেছে, বড়ই অধম্মের ময়না। বৌঠান আমারে দেখলেই উরু চুলকায়, মাথা আমার ঠিক থাকে না। কিন্তুক লাটুবাবুর বিশ্বাসভাজন মানুষ আমি — তল্লাটে ছোটবংশীর সুনাম নষ্ট হতে দিই কি করে। দেশে পোষ্যবর্গ আছে, অবিশ্বাসী হলে তাদের পাপ হবে।

ময়না নিজের মনেই বলল, গোলাম।

ঈশানীদির জন্য ময়নার কষ্ট হয়। বাপের হাড়বজ্জাতি টের পেয়ে মাথা খারাপ। কখনও পটের রানি কখনও দস্যুরানি নিজের ঘরেই টেপ চালিয়ে ইংরাজি গানের সঙ্গে নাচে। আর ষাঁড়ের মতো চিল্লায়। কি গান সে বোঝে না। অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে ঈশানীদির শরীরে বিষ জমলেই সাপের মত ফণা তুলে নাচে।

এই বিষ নামানোর ওঝা একজন চাই। সকালে নাকি নতুন ডাক্তারের কাছে ছুটে গেছে। একপ্রস্ত জ্বালিয়ে ডাক্তারকে, বাড়ি ফিরেছে।

আকাল তাকিয়েই আছে। বউ তার বড় সময় নিয়ে আহার পর্ব সারে। সবার খাওয়া শেষ।

ময়না আগুন তোলার হাতাটি সম্পর্কে আর টু শব্দ করছে না। বুড়ি শাউড়ি দু-হাতা আগুন তুলে নিয়ে গেছে নিজের আলাদা আলসেয়। দু-হাতার বেশি সে নিতে দেয়নি। আলসের সঙ্গে হাতাখানাও সঙ্গে নিয়ে গেছে। আগুন চুরির স্বভাব আছে বুড়ির।

ভেবেছে, সবাই ঘরে ঢুকে গেলে, ঘুমিয়ে পড়লে বাকি আগুনটুকু আলসেয় তুলে নিয়ে যাবে।

ময়না সব জানে। বোঝে। কথা বলে না।

আকালের দিকে তাকাতে তার ভালও লাগে না।

শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না। খাক না খাক দণ্ডটি ঠিক উঁচিয়ে থাকে। আকালকে পাশে নিয়ে শুতেও ঘেন্না তার। তবু শরীর বলে কথা, যখন শরীর মানে না, ছোটবংশী দেখা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যায়, তখন আর পারে না। যা পায় তাই সই। শরীরে বিষ জমলে এটা হয় সে বোঝে।

মরণ ! সময়ে অসময়ে হাত দিলেই এক ঝটকা।

মেয়ে মানুষের সম্বল ওই একখানা আগুনের হাতা। মীরাদি কি করে ! তার দোষও দিতে পারে না। যায় কোথায়। ওই হাতা সম্বল করে পড়ে আছে। কত কথা যে ওড়ে।

একবার ঈশানী উলঙ্গ বাপকে তাড়া করেছিল। রাত দুপুরে সে এক কেচ্ছা। দরজা বন্ধ ! করিডোরে ফোঁস ফোঁস শব্দ। দোতালায় পোকামাকড় আসবে কি করে ! কাঁঠাল গাছের ডাল বেয়ে যদি ঝুলে পড়ে। বারান্দায় গড়িয়ে ওটা নামতে পারে। ঈশানী দরজা খুলতে ভয় পাচ্ছে। উঁকি জানালায়।

আরে করছে কি লোকটা !

জাপটে ধরেছে। শাড়ি টানছে, সায়া টানছে।

দু-হাতে প্রবল বাধা। কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই কারো। চিত করে ফেলে দিচ্ছে—আর দুটো অজগর যেন ফুঁসছে। মধ্যরাতে নাটক দেখে ঈশানীর মাথা খারাপ। আবছা অন্ধকারে কিছু বোঝাও যায় না। দরজা খুলতেও পারছে না আতঙ্কে। বন্ধ দরজার ও-পাশে লোকটা ঢুকে গেল কি করে ! মীরাদি চিৎকার চেচাঁমেচি করছে না কেন। কেমন ধন্দ দেখা দিতেই সে ডাকল, ও মীরাদি লোকটাকে জাপটে ধর। আসছি।

তারপর চিৎকার, মেরে ফেলল, চোর চোর ! মীরাদিকে মেরে ফেলল। এক ঝটকায় দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিতেই বাপ তার পালাচ্ছে। লুঙ্গি খুলে গেছে। লুঙ্গিতে জড়িয়ে ধপাস করে পড়েও গেল। উঠতি বয়স ঈশানীর। লোকজন সব দরজা খুলে বের হয়ে আসছে। আলো জ্বলে উঠল। ঈশানী ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

চোর ! কোথায়।

মীরা মাথা নিচু করে বসে আছে দেয়ালে ঠেস দিয়ে। কে কি

বুঝল কে জানে—যে যার মতো দরজা বন্ধ করে ফের শুয়ে পড়ল।

সেই থেকেই নাকি ঈশানীর মাথা খারাপ। কিছুদিন খায় না, কিছুদিন রাতে ঘুমায় না—কেবল ছাদে পায়চারি করে। তারপর এই করে ঈশানী বড়ও হয়ে গেল। সব গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন নিজের মতো থাকে, কাউকে পাত্তা দেয় না। ছুটিতে গাঁয়ে, ছুটি না থাকলে শহরে। ময়নার মনে হয় ঈশানী একদিন সত্যি পাগল হয়ে যাবে।

ময়নার মনে হয় আজ বুড়ি ফের আগুন চুরি করবে। হাতাখানা বুড়ি লুকিয়ে ফেলেছে। চোখের আড়ালে কাজ সেরে ভেবেছে—হারামির বেটিকে বেশ জব্দ করা গেল। কেউ টের পায়নি।

সে আগুনের ওমে বসে হাত চাটছে। আর কত কিছু ভাবছে। আকাল আর পারে! সে পুরুষ মানুষ না! আগুনের হাতাটির খোঁজে আকাল আখার পাড়ে বসে ছটফট করছে। শেষে পেটের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিতেই ময়নার মাথা গরম। একদম হাত দেইবে না। হাত ভেইঙে দেব। পুরুষমানুষ তুমি! লজ্জা আছে তোমার। হাত সরাও বলছি!

এক ঝটকায় হাত সরিয়ে দিয়ে ফের বলল, জাগালদারি করতে পার না। মুনিষ খাটতে পার না। এক পাল এণ্ডিগেণ্ডির জন্ম দিয়ে খালাস। বাপ পিতামোর ধম্ম নিয়া থাকতে চাও!

ও কথা বুললে খারাপ হবে ময়না। বাপ পিতামোর ধম্ম দেখাবি না! আমি মাছমারিয়ে জাত। মীনের অধীশ্বর বুঝলি!

ময়না খুক খুক করে হেসে ফেলল। হায়রে অধীশ্বর আমার! খেতে পাস না, নাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াস, আমার অধীশ্বর! বুললে খারাপ হবে। কি খারাপটা হবে শুনি। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তু আমার কচু করবি।

বুড়ি তার ঘরে। খলপার দরজা বন্ধ। বাচ্চাগুলি ঘরে। ছেঁড়া মশারির নিচে।

আমার কিন্তু মস্তিষ্ক ফুটছে ময়না।

ফুটোক। ফুটতে দাও। অকম্মা মানুষের গলায় দড়ি পর্যন্ত জোটে না!

আমি অকম্মা মানুষ! সকাল থেকে জালখানা পিঠে নিয়ে বের হই না? আমরা হলাম গে মাছ মারার জাত। জলে মীন ধায় আমরা তার পিছু ধাই। মীনের কথা জানিস? ব্রহ্মা স্বয়ং মীনরূপে বিরাজ

করেছেন।

বাড়িতে এই চিল্লাচিল্লি শুরু হলেই, শাউড়ি কি শুনতে পায় না পায় কে জানে—চিল্লাতে শুরু করবে।—আরে তরা কে আছিস, চলে আয়। আমার দজ্জাল বউটা আকালরে মেইরে ফেলল রে ! আমার কি হবে রে ! আমার দশটা না পাঁচটা না, একটা, তারে এত জ্বালায়। গলায় দড়ি দিতে বলে। দড়ি দিতে হয় তুই দেগা। তোর মাটা দশভাতারি—অ পোড়ামুখো আকাল, বউরে লাথি মেরে বের করে দে নারে বাপ ! মাগির কী তেজ !

বউকে খুশি রাখতে আকাল তখন নিজেই তেড়ে যায় এই শালির শালি বুড়ি, চিল্লাছিস ক্যানে ? বউরে আমি বুঝব। তোর মাথা ব্যাথা কেনে ।

তরে বিষ দেবে বউ। তুই আমার বিষে শক্ত হয়ে থাকবিরে বাপ !

ময়না খুঁটিতে হেলান দিয়ে ভাবে, আগুন লাগিয়ে সব ছারখার করে দিলে হয়। সব পুড়ে মরলে তার বুঝি হাড় জুড়ায়। দিন নাই রাত নাই শুধু গতর দিয়ে সংসার ধরে রেখেছে, কারো কুটো গাছটি নাড়ার মুরোদ নেই, আর বুড়ি কিনা চিল্লাচ্ছে—তরে বিষ দিয়ে ও মাগি দেখিস কখন মেইরে ফেলে রাখবে !

আকাল দেখল, থালা বাসন ধুয়ে বউ ঘরে তুলছে সব।

আকাল আশায় আশায় বসে আছে। বসে বসে দাঁত খোঁচাচ্ছে। কতক্ষণে কাজ কাম হবে। কতক্ষণে দুজনে মশারির নিচে ঢুকে যাবে।

ঘরে ছুটকি বড়কি কাঁথায় নিচে মাচানে শুয়ে আছে। বরফের মতো হিমেল উত্তরে হাওয়ায় ঘরের সব টাল—কাঁথা কাপড় বালিশ সব। আলসেয় তুষের আগুন জিয়ানো থাকলে, মাচানের নিচে ঠেলে দরজা বন্ধ করলে উষ্ণতা জন্মায়। মাচানের নিচে আলসে রেখে না দিলে ময়নার আতঙ্ক কোনদিন না সব ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে থাকবে। সারা আঘুন পৌষ তুষের জন্য ময়না লাটুবাবুর বাড়ি ধান ভানে। শুধু গরম, গরমের জন্য এই তুষ। এই গরম থেকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সব। গরম না থাকলে মানুষ বাঁচে না, কীট পতঙ্গ বাঁচে না। সৃষ্টির বিনাশ, জমি বল বীজ বল সবই হলগে গরমের দাস। চাষে মাটি ঝুর ঝুর করে রাখলে বৃষ্টিপাত, বীজ বপন, জমির ওমে অঙ্কুরোদগম।

ময়না বোঝে তার শরীরেও ওম ধরেছে। মরদ টের পেয়ে ক্ষেপে আছে।

সে তখনই বুড়ির দরজায় গিয়ে চেঁচাল, এই বুড়ি দরজা খোল !

আগুনের হাতা ছুপালি ক্যানে ! বুল ছুপালি ক্যানে ! দু-দিন বাদে মরণ, আগুন দিয়ে তুর কি কাম। মর না। শক্ত হয়ে থাক। এক পেট অন্ন বাঁচে।

॥ ছয় ॥

ঈশানীকে মাঝে মাঝে সুধাময়ের মনে হয় উচ্ছল, যৌবনবতী, সাহসী। কোনো সময় মনে হয় এক ভীরু ছেলের প্রেমে পাগল। ঈশানী চায় কোনো ভীরু ছেলের হাত ধরে মাঠ পার হয়ে যেতে। অথবা জ্যোৎস্নায় বিচরণ করতে। ভীরু ছেলেটি সে কি না জানে না—অন্তত তার কোনো ইঙ্গিত সে পায়নি। ঈশানীর খুব ইচ্ছে হয় সে কোনো পাহাড়ে মোটরবাইকে উঠে যাবে, পেছনে ভীরু ছেলেটি বসে থাকবে কোমর জড়িয়ে।

সে শুধু তার ইচ্ছের কথা বলে। আর কিছু বলে না।

আবার মনে হয় সে যথেষ্ট শিক্ষিতা, অহঙ্কারী, প্রকৃতি পাগল অথচ কঠোর। তার জীবনে মিথ্যাচারের স্থান নেই। ইতরামিকে ক্ষমা করে না। ইতর মানুষকে সব সময় এড়িয়ে চলে।

তার চোখ বড় মিষ্টি। অমায়িক হাসি ঠোঁটে। সে বড় অসহায়, সরল এবং নিষ্পাপ এমনও মনে হয় তার। ঈশানী বড় একা এবং তার শরীর ছাড়া কিছু আর অবলম্বন নেই।

কখনও কেন যে মনে হয়, মানসিক ভারসাম্যেরও অভাব থাকতে পারে। সরল বলেই ঠাকুর পঞ্চতীর্থকে সহজেই বিশ্বাস করতে পারে। ঘণ্টাকর্ণ পলাশপত্রের জন্য অবলীলায় চলে যেতে পারে পিচাশিতলায়। টিভির বিজ্ঞাপনে খুসকির এত ওষুধ থাকতে কেন যে তার পলাশপত্রের দরকার হয় ! তার এত সুন্দর চুল, মাথায় বিন্দুমাত্র খুসকি আছে বলেও মনে হয় না, হেমন্তর হাওয়ায় দাপাপাপি করে বেড়ায় তার নীলাভ চুল, আহাম্মকের মতো তাকিয়ে থাকলে, ঈশানী লজ্জায় মুখ নিচু করে ফেলে।

কী দেখছ !

কিছু না।

সুধাময় এ-ছাড়া আর কোনো ভাষাও খুঁজে পায় না। তার ভাল লাগার অলৌকিক মহিমা আর কি ভাবে প্রকাশ করা যায় সে জানে না।

আমার ঘর তোমার পছন্দ ! এদিকে এসো ! এটা আমার ছোট্ট লাইব্রেরি। দরজা পার হয়ে নরম সিল্কের পর্দা সরিয়ে তার পড়ার

ঘরটি দেখায়। সাজানো সব বই। কবিতা প্রবন্ধ গল্প উপন্যাস ছাড়াও কিছু বিখ্যাত চিত্রকরের ছবি। ছবির সমজদার সে কতটা জানে না, তবে অ্যালবামগুলি খুবই দামি বুঝতে কষ্ট হয় না। ফ্যাশানের সাপ্তাহিক কিংবা পাক্ষিক, কি ইংরেজি, কি বাংলা কোনোটাই পড়ার ঘরে তার থাকে না। সব বিছানায়, না হয় টয়লেটে। টয়লেটটি দামি চাইনিজ স্টাইলের এবং শোবার ঘরে এমন আলগা টয়লেট টিভির বিজ্ঞাপন ছাড়া কোথাও দেখেনি। বিজ্ঞাপনের ছবির মতো সাজানো বেডরুমে কোথাও বিন্দুমাত্র অসংগতি চোখে পড়ে না।

সরল বলেই অন্ধকারে তার সাইকেলের পিছনে লাফিয়ে বসে পড়েছিল, তার ইচ্ছের কথা বলেছিল, আমার চাই মোনালিসার মতো কপাল। তাকে এরোবিকস শেখাবার জন্য সহজেই গরম হাউজ কোট ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছে। শুয়ে পড়েছে, পা তুলে দিয়েছে উপরে, নারী সহজ সৌন্দর্যের, তার সারল্য না থাকলে বিরল উপমা সৃষ্টি করতে যেন পারত না।

এই আমি।

এই আমার সম্বল।

কতদিন আর, কিছুদিন, দিন মাস যাবে, বছর যাবে তারপর আমার এই শরীরের কোষে কোনো পোকার দংশন ঘটবে, পবিত্রতা আর থাকবে না। কবিতার মতো তাকে ভালবেসে ফেলেছি। বিন্দুমাত্র ছন্দপতনের সম্ভাবনা নেই শরীরে। তাকে সাজিয়ে না রাখতে পারলে সে আমার সঙ্গে থাকবে কেন! বিদ্রোহ করতে পারে—তখন আমি যাব কোথায়! আমার এই ইচ্ছের কথা কেউ বুঝতে চায় না জানো।

ঈশানীকে কখনও মনে হয় সৌন্দর্যের উপাসক। সে তার শরীরে চায় বিন্দু বিন্দু কুয়াশা ভালবাসা হয়ে জমুক। ভোরের কুয়াশা মেখে সে দাঁড়িয়ে থাকে গাছের নিচে। তাকে ডাকে, এই যে নতুন ডাক্তার, আমি এখানে। তারপর কেন যে সুধাময় বেখাপ্পা কিছু কথা বলেছিল, কলকাতায় আর কে থাকে তোমার সঙ্গে?

মীরাদি থাকে, টুকি দিদা থাকে। বড় মামা থাকে। বাপি কলকাতায় গেলে থাকে।

কলেজ না থাকলে, পড়া না থাকলে কী কর?

বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে কোয়ালিটি রেস্তোঁরায় এক প্লেট চিজ পাকৌড়া অর্ডার দিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। কোনোদিন বিড়লা একাডেমিতে ছবির প্রদর্শনী থাকলে, সেখানে গিয়ে চুপচাপ বসে

থাকি। মাধুরী ম্যাডোনার নাচ গান হাসি হোল্লোর আমার ভাল লাগে। সুপারহিট মুকাবলা—দারুণ দারুণ। গাতা রহে মেরা দিল দেখতে না পেলে কি যে মিস করি বুঝবে না। জ্যানেট জ্যাকসন যখন গায়—ডিপার ডিপার আমি জানো নিজের মধ্যে থাকি না। আমার যে কি হয়, শরীর থেকে সব খুলে ফেলে কখন যে সম্পূর্ণ একা হয়ে গেছি বুঝি না। আর কিছু না ভাল লাগলে, ক্যাসেট চালিয়ে ধুম ধাড়াক্কা নাচি !

তোমার কোনো বন্ধু নেই ?

ভাল লাগে না। সহ্য করতে পারি না।

বারে এই তো বয়েস। কেউ তোমাকে ভালবাসে না।

না। আমাকে কে ভালবাসবে বল।

তুমি তো আবার চলে যাবে। কবে ছুটি শেষ হচ্ছে ?

আমি আর যাব না ডাক্তার। আমি যাব না। প্লিজ তুমি আমাকে যেতে বল না। আমি যে চাই একটা চিঠি লিখব।

কাকে ?

আমার মাকে। অনেক দূরদেশ থেকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয়। লিখতে ইচ্ছে হয়, তোমরা কেমন আছ ? আমি ভালই আছি। এখানে জীবনযাত্রা খুবই কঠোর, কঠিন। আজ আমার লন্ড্রির দিন। সব কাচাকাচি করতে হবে। কাল থেকে আবার সাপ্তাহিক ব্যস্ততা। আজ খিচুড়ি আলুভাজা করে খেলাম। মা, তোমার ওই রান্নার রেসিপি জানিয়ে দিও। বন্ধুদের বলেছি। তাদের একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াবার খুব ইচ্ছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের খুব চাপ। এখন পড়াশোনা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। সামনেই দুটো সেমিস্টার, দু'জন আমেরিকান ছাত্রকে পড়াচ্ছি। তারা আমার খুব অনুগত। একদিন রাতে তাদের সঙ্গে বার্চগাছের পাতাঝরা দেখতে গেছিলাম মিসিসিপি নদীর পাড়ে। কি সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল—বরফের উপর পাতা ঝরছে। ফল শুরু হয়ে গেলেও কিছু পাতা ঝরা বাকি থাকে—দূরের আকাশে কি আশ্চর্য স্নিগ্ধতা—কেবল তোমার মুখ মনে পড়ছে মা।

সুধাময় বোঝে, ঈশানীর একটা স্বপ্নের পৃথিবী আছে। সেখানে তার ইচ্ছেরা ঘুমিয়ে থাকে নদীর জলে ডুবে থাকা ঝিনুকের মুক্তোর মতো। বৃষ্টি হলে, ঝিনুক মুখ খুলে দেয়, মুক্তোগুলো নড়ে চড়ে বেড়ায়। বৃষ্টি থেমে গেলে ঝিনুক ঘুম যায়, মুক্তোগুলো নড়াচড়া করে না। আশ্চর্য এক উষ্ণতায় তারা ঝিনুকের গভীরে নিদ্রা যায়।

তোমার মাকে চিঠি লেখো না ! কলকাতায় থাকো !

আমার মা !

কেমন অবাক হয়ে ঈশানী তাকায়। আমার মা ! না না, আমার মা না। আমার মা সে যে আরও কিছু। কি করে বোঝাবো আমার মা কেমন হবে—না না আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না—কেমন অধীর হয়ে পড়ছে সে তার প্রকৃত মায়ের কথা প্রকাশ করতে পারছে না বলে, ক্ষোভে দুখে ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে।

সুধাময় আর কিছু বলতে সাহস পায় না।

এ কেমন মেয়ে সে বোঝে না। স্বপ্ন হোক বাস্তব হোক— মা তো বদলায় না। সে তার মা সম্পর্কেও একটা জগৎ তৈরি করে নিয়েছে— এ কি কোনো বিচ্ছিন্নতা থেকে। সামাজিক মোহ মুক্তি থেকে—সে না বলে পারল না, জানো মা আমার চিঠি পেলে বালিকার মতো হয়ে যায়। ভাই-বোনদের পড়ে শোনাবে, বাবাকে শোনায়— পাড়া প্রতিবেশীদের খবর দেবে, খোকা চিঠি দিয়েছে। একটা চিঠি পেলে গোটা বাড়িতে উৎসব শুরু হয়ে যায়। বাবা অফিস থেকে ফিরে চিঠিটা বার বার পড়বেন। আট দশ ঘণ্টাও লাগে না—যদি যাই, অথচ যেতে পারি না। চেম্বার না করলে আরও দুটো পয়সার মুখ দেখব কি করে !

তোমার মা খুব সুন্দর ?

মা আবার কখনও অসুন্দর হয়।

হয়। আমি তো আয়ার কাছে মানুষ। আয়ার কোলে বড় হয়েছি। তারপর মীরাদি। জানো মীরাদির জন্য আমার কষ্ট হয় ! তার কেউ নেই। স্বামীটা পাগল, রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে। খাবার সময় হলেই হাজির। গাছতলায় বসে খায়। খাওয়ার পর আর কি বলে জানো, বউকে বলবে, আমি পেট ভরে খেয়েছি। ও যেন চিন্তা না করে।

মীরাদি ঘর থেকে বের হয় না। জানালায় গোপনে দাঁড়িয়ে দেখে।

মীরাদির বর নিচ থেকেই চিৎকার করে বলবে, ও বংশীদা বউকে বলবে, আমার মেলা কাজ। লাটুদার মিটিং আছে। মিছিলে যেতে হবে। লোক জোগাড় করতে হবে। আমার কি বসে থাকার সময় আছে। আমি যাই। পরে দেখা করব।

সুধাময় বসে আছে জানালার কাছে। সামনে করিডোর পার হয়ে কাঁঠাল গাছ। তার ডাল লেগে আছে গ্রিলে। তারপর গাঁদা ফুলের

গাছ, একটা চালতা গাছও দেখতে পায়। গোলার পর গোলা—খামার বাড়ি পার হয়ে ধানের জমি, পুকুর, ট্রাকটার। ঈশানী মীরাদির বরের খবর দিয়ে নিচে নেমে গেছে। আজ তার ইচ্ছে হয়েছে, নিজের হাতে চা করে খাওয়াবে তাকে। বংশী তাকে ডাকতে গিয়েছিল।

দিদিমনির শরীর ভাল না ডাক্তারবাবু? শিগগির যান। বাবু আপনাকে খবর দিতে বলেছে।

এসে সে আহাম্মক। কিছুই হয়নি। ঈশানী বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে কি খুশি!

এটা যে অনুচিত কাজ হয়েছে সে বোধও বোধহয় তার নেই। বাগানটি বেশ জায়গা জুড়ে। নানা বিদেশী ফুলের গাছও আছে। গোলাপ ডালিয়া ক্রিসেনথিমাম, মোরাম বিছানো রাস্তায় আজ একেবারে লাল পেড়ে সাধারণ শাড়ি আর হালকা পশমের চাদর গায়ে ডাক্তারকে অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছুটা বিরক্ত। উপদ্রব বলেও মনে হয়েছে। তার সামনে পরীক্ষা। এম এসে সুযোগ পাওয়া কি কঠিন, আর কি কমপিটিশনের যুগ ঈশানীর মাথায় যদি থাকে। তবু সে তার বিরক্তি প্রকাশ করতে সাহস পায় না। যেন লাটুবাবু না ডেকে পাঠালেও ঈশানীর শরীর খারাপ শুনলে না এসে থাকতে পারত না। ঈশানীকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতাই তার নেই।

সে সিঁড়ি ধরে উঠে যাবার সময় ঈশানীর শরীরে সেই সুন্দর গন্ধটাও পেয়েছে। ঘরে ঢুকে বুঝল ঈশানী নানা ধরনের বিদেশী আতরে অভ্যস্ত। তারপরই শুরু হয়েছিল, তার বৈভব দেখাবার পালা। হারুদা গাছতলায় বসে খায় সে খবরও দিয়েছে। হারুদা কি গান গায় তাও বলেছে। 'লাঠিসোটা কলের ঝাঁটা বানাইল কোম্পানি' যখন গাইতে গাইতে বড় সড়কে উঠে যায়—মীরাদি ফুঁপিয়ে কাঁদে।

এত সব খবর দেবার পর বলেছে, সকালে উঠেই জানো ডাক্তার মনে হল কি যেন ইচ্ছে হচ্ছে। তারপর অনেকক্ষণ তলিয়ে ঠিক বুঝে ফেললাম, তোমাকে নিজ হাতে চা বানিয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মীরাদি ছাড়া আশেপাশে কেউ নেই। তবে সে আসার পর কেউ কেউ চুপি দিয়ে দেখে গেছে নতুন ডাক্তারকে। ঈশানী দেখে না ফেলে, সেজন্য করিডোরের জানালায় এক পলক তাকে দেখেই দৌড়। ধমক খেতে পারে, কিংবা ঈশানী বলতে পারে, এখানে কি, যাও! সকালেই ঈশানী টিভি চালিয়ে দিয়েছে, দেখুক না দেখুক, টিভি

না চললে ঈশানী বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করে। না হলে এই সকালে কেউ টিভি চালায়। এত সকালে টিভিতে কি থাকে! টিভি চালিয়ে ঈশানী বলল, আমি আসছি। কাউন্ট ডাউন শুরু হবে।

টিভির হট্টগোল সে বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না। তার খুব উৎসাহও নেই দেখার। দেখলেও এত জোরে চললে, মাথা কেমন তার বন বন করে। ঈশানীকে ডাকল, শোনো।

দরজা থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখল ঈশানী। কী তীব্র ছটা মুখে চোখে—জানালা দিয়ে সকালের নরম শীতের রোদ ঈশানীর মুখে চোখে—ঈশানী যেন তার দিকে তাকাতে পারছে না, কাছে এসে বলল, কিছু বললে!

বড্ড কানে লাগছে।

ঈশানী ছুটে গিয়ে টিভির ভলিউম কমিয়ে দিল। তারপর সুধাময়কে দেখল, সুধাময় টিভি না দেখে তাকে দেখছে।

আর কিছু বলবে?

এত সকালে টিভি শুনতে তোমার ভাল লাগে!

এক্ষুনি কাউন্ট ডাউন শুরু হবে।

কাউন্ট ডাউন মানে।

কাউন্ট ডাউন! কেন তুমি টপ টুয়েন্টি কাউন্ট ডাউন কখনও দ্যাখনি।

না। বোকার মতো না বলে ঠিক করল কি না বুঝতে পারছে না। ডিশ অ্যান্টেনা, স্টার, কেবল টিভির কল্যাণে নানা মজা ঢুকে গেছে মানুষের ঘরবাড়িতে। অলৌকিক এক বিশ্ব নানা মজা নিয়ে হাজির—তার, সে খবরই রাখে না। ঈশানী কি ভাবল কে জানে, সে শুধু বলল, আমি আসছি। তুমি কিন্তু পালাবে না ডাক্তার।

অদ্ভুত রঙিন হুল্লোল—আর বিজ্ঞাপনের নানা কায়দা, অর্ধনগ্ন, উলঙ্গ সব মুখ। আসছে যাচ্ছে। কিম্ভূতকিমাকার ফ্যাশানের চিত্রলিপি, নদীর জল, নারীর সাঁতার কাটা। ফুটে উঠছে, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

গানের একবর্ণ সে বুঝতে পারছে না। এলোপাথাড়ি নাচে যৌনতা ছাড়াও কিছু নেই। অথচ আশ্চর্য এক মোহ সৃষ্টি করছে। টিভির পর্দা থেকে সে চোখ ফেরাতে পারছে না।

ঈশানী ফিরে এল যেন সম্পূর্ণ নাজেহাল হয়ে। তার মুখ দেখেই সুধাময় এটা বুঝতে পারছে। চুল এলোমেলো, চাদর ঠিকঠাক নেই গায়ে— শাড়ির আঁচলও ঠিক রাখতে পারছে না। যেন সব শরীর

থেকে টুপ করে খসে পড়বে। ধপাস করে সব ট্রে থেকে ফেলেই দিত—কত আনাড়ী ঈশানী—পড়ে না যায় সেজন্য সে উঠে ঈশানীকে সাহায্য করতে গেলে, ট্রেটা ছোঁ মেরে সরিয়ে নিল ঈশানী।

না না আমি পারব। তুমি দ্যাখো না।

সত্যি সে পারল।

এই সামান্য পারা যে কত অসামান্য সুখানুভূতি, ঈশানীর মুখ না দেখলে বোঝা কঠিন। সে পাশে বসে চিনেমাটির কারুকাজ করা পট থেকে কাপে লিকার ঢেলে দিল। গিন্নিবান্নির মতো সে পরিপাটি করে এগিয়ে দিল কাপ প্লেট। সেন্টার টেবিলে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। দু একটা ফুল তার কার্পেটে ঝরে পড়েছে। সে ঝরে পড়া ফুলগুলি তুলে নিল— তবে ফেলে দিল না। হাতের মুঠোয় রেখে দিল। এ-সব কাজ তো তার মীরাদিই করতে পারে। মীরাদি এদিকে আসছেও না। সে যে পারে—এটা প্রমাণের চেষ্টাতেই বোধ হয় মীরাদিকে এদিকে আসতে দিচ্ছে না।

সুধাময় চা-এ সামান্য চুমুক দিয়ে বলল, দারুণ।

ঈশানী খুশি হয়ে বলল, জানো চা আমি নিজে করেছি।

তাই নাকি। বাঃ। যেন সুধাময়ের কাছে এটা সপ্তম আশ্চর্যের আর এক আশ্চর্য। চোখে মুখে এই বিস্ময়ের ছলনা ঈশানীকে বোধ হয় আরও উৎসাহিত করে তুলল।

সে উঠে গেল টিভির সামনে। কালারের সামান্য গোলমাল অ্যাডজাস্ট করে ফিরে এসে ঘড়ি দেখল।

এক্ষুনি আরম্ভ হবে।

তারপর এত নিবিষ্ট হয়ে গেল ঈশানী যে মনেই হয় না বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে টিভি বাদে আর তার কোনো সম্পর্ক আছে। শুধু একবার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলল, ববি আলব্যামের গুড এনাফ গানটি আমার খুব প্রিয়।

এখন প্রায় ঈশানী একাই কথা বলছে।

জ্যানেট জ্যাকশনের 'ইফ' কিংবা 'এগেন' আজ কাউন্ট ডাউনে থাকবে কি না বুঝতে পারছি না। কি করছে, এত দেরি করছে কেন। সে আবার তার ঘড়ি দেখল। সুধাময় না বলে পারল না, কাউন্ট ডাউন, ব্যাপারটা কি বলত!

উফ ডাক্তার, তুমি কি, তুমি কিচ্ছু জান না। টপ টুয়েন্টি কাউন্ট ডাউন তুমি জান না! তুমি বেঁচে আছ কেন! মরে যেতে পার না।

হুইটনি হিউসটনের 'বডিগার্ড' সিরিজের 'আই অ্যাম এভরি ওম্যান' কি গান কি গান! শরীরে মুহূর্তে আলো জ্বলে ওঠে। কে যেন সুইচ টিপে দেয়। যদি এ-সব গান ডাক্তার তুমি শুনে না থাকো, ইউ হ্যাভ নাথিং।

তারপর ঈশানী হতাশায় কেমন ভেঙে পড়ল।

এখনও শুরু হল না!

তোমার ঘড়ি ঠিক আছে তো?

ঈশানী বলল, দাঁড়াও। বারান্দায় ঢুকে দেয়াল ঘড়ি দেখে বলল, ইস আমি যে কি না। ঘড়িটা দেখছি খুব ফাস্ট যাচ্ছে। সে কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করে কানে ঘড়ি রেখে শব্দ শুনল—তারপর ফের পাশে তার ধপাস করে বসে পড়ল। শাড়ি টেনে দিল পায়ের পাতা পর্যন্ত। তারপর টপ টুয়েন্টি কাউন্ট ডাউন শুরুর জন্য উদগ্রীব হয়ে বসে থাকল।

আবার সেই নদীর জল, পাহাড়ের উপত্যকা, অনন্ত আকাশ কিংবা রাতের নক্ষত্র পার হয়ে কোনো এক অলৌকিক পৃথিবীর শোভায় নারীরা প্রায় নগ্ন হয়ে ঢুকে গেল—এ পৃথিবী মানুষের শব্দ স্পর্শ গন্ধের অতীত সুধাময় বুঝতে পারল।

ঈশানীর দুটো একটা কথা—ইস ইরোটিকা সিরিজের কোনো গান যদি দেয়।

এটা কে গাইছে ঈশানী?

ববি ব্রাউন।

এটা?

পিটার গ্যাব্রিয়েল।

কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

সুধাময় বুঝল, এইসব গানে যৌনতা ছাড়া আর কিছুই নেই—হট্টগোল—বাজার এই দুটো শব্দই বেশি করে প্রয়োগ করা চলে গানগুলি শোনার সময়।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল ঈশানী, শ্যারন, শ্যারন। 'মাই অ্যাঞ্জেল ব্লু'।

কেন যে সুধাময়ের মনে হল, এই গানে যৌনতা থাকলেও, সুর মাধুর্যে কেন জানি অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। উষ্ণ নরম বলের মতো ঈশানীকে তার বার বার জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে।

তারপর সে দেখল, সারা শহর, নদীর সাঁকো পার হয়ে এক আশ্চর্য উচ্ছ্বাসের ভিতর ঢুকে যেতে চাইছে নারী। পুরুষের কোমর জড়িয়ে আছে সে। দুরন্ত গতি। আকাশ আর বিরাজমান রহস্যের নিচে নারী

পুরুষের এই যৌনতা সুধাময়কে কিঞ্চিত ফাঁপড়ে ফেলে দিল।

মোটর সাইকেলের পেছনে নারী জড়িয়ে রেখেছে পুরুষের কোমর। দুরন্ত গতি আরোহীর। সব ভেদ করে গোপন গভীর অভ্যন্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা। নারী পাগল হয়ে গেছে যৌনতার অধীরতায়। সে সাপের মতো প্যাচিয়ে পুরুষটির সামনে বসে যেতেই সুধাময় কেন যে চোখ বুঝে ফেলল। একা সে এই যৌনতা উপভোগ করতে পারত। কিন্তু পাশে ঈশানীর মতো লাবণ্যময়ী বসে থাকায় তার দৃশ্যটি দেখতে সংকোচ হচ্ছিল।

গানের মিউজিক কেমন অপার্থিব করে তুলছে ঘরটাকে। সুধাময় সবই জানে। এম টিভির কল্যাণে বিশ্বের পপ সাম্রাজ্য আজ ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রদেশেও মানুষের অন্দর মহলে এসে পৌঁচেছে। এখন যে কোনো আগ্রহী শ্রোতাই ঘুম ভেঙে দেখতে পারেন মোস্ট ওয়ান্টেড, ব্রেকফাস্ট হতে পারে এশিয়া কিংবা ইউরোপের টপ টুয়েন্টি ভিডিও কাউন্ট ডাউন দেখতে দেখতে। সে জানে, পার্টিজোন বা মাস্টারমিকস প্রোগ্রামের সামনে এই ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষ বসে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাইকেল জ্যাকসন বা ববি ব্রাউন, ম্যাডোনা বা লাওনেল রিচিও আর অজ্ঞাত নয় কাগজ আর টিভির দৌলতে। টপ টুয়েন্টি কাউন্ট ডাউনের কথাও সে শুনেছে—তবে যৌনতা সর্বস্ব এই সব গানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তার নেই।—সে তাই কাউন্ট ডাউন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে চেয়েছে ঈশানীর কাছে।

সে দেখল সিল্কের সেমিজ গায়ে নীলাভ চুলের এক মেয়ে শুয়ে আছে সমুদ্রের ধারে। সব শঙ্খচিল উড়ে যাচ্ছে কোথায়। শামুকেরা এগিয়ে যাচ্ছে। উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক প্রজাপতি—একটা অতি কুৎসিত সাপও ভেসে উঠল পর্দায়—তার ফণা, তার রঙিন গাত্রবর্ণ টিভির পর্দায় বড় হয়ে যেতে যেতে কোনো মানবীর অবয়বে ধরা দিল ফের।

যুবতী শুয়েই আছে। তারপর মিউজিক আরও প্রবল হলে সে উঠে দাঁড়াল, হেঁটে যেতে থাকল। শরীর যেন আর দিচ্ছে না। চুল ছড়িয়ে আছে পিঠে। সমুদ্রের হাওয়ায় নরম মসৃণ সিল্কের ম্যাকসি নিতম্বের ভাঁজে অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইছে। নারীর এই মহিমায় সুধাময়ের শরীর শির শির করছে। সে ভিতরে বেশ ছটফট করছিল—যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

আর সে দেখল, ঈশানী এই সংগীত এবং মিউজিকে আশ্চর্য মুগ্ধ, এবং মেয়েটির টলে টলে হাঁটা দেখতে দেখতে কেমন এক ঘোরে

পড়ে গেছে।

সে ডাকল, ঈশানী।

হুঁ।

আমি উঠছি।

ঈশানী সাড়া দিল না।

ঈশানী সোফায় মাথা এলিয়ে দিয়েছে।

শরীর খারাপ লাগছে?

ঈশানী তার দিকে তাকাল না। শুধু হাত বাড়িয়ে দিল।

সুধাময় কি করবে বুঝতে পারছে না। সে ডাক্তার মানুষ। সামান্য নাড়িজ্ঞান তার জানা। হাতের উষ্ণ শিরায় সে হাত রাখল। বেশ চঞ্চল মনে হচ্ছে। অন্য কোনো গোলমাল আছে টের পেল না।

অবাক হাত ছেড়ে দিলেও, ঈশানী হাত সরিয়ে নিল না। কী চায়। তোলপাড় করা মিউজিকে ডুবে যাচ্ছে কি সে! কিংবা যে নারী টিভির পর্দায় অদৃশ্য হয়ে গেল তার কোনো অসহায় ভঙ্গী কি গ্রাস করছে ঈশানীকে।

সে হাত সরিয়ে দিয়ে না বলে পারল না, কি হয়েছে তোমার বলবে ত। কোনো কষ্ট হচ্ছে?

ঈশানী ওঠার চেষ্টা করেও যেন পারছে না। ঘোরে পড়ে গেলে এই হয়। শরীরে তার বুঝি বিন্দুমাত্র শক্তি নেই। ঘোরে পড়ে গেলে পিচাশিতলায়ও নিশীথে চলে যেতে পারে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে কোনো ঘোর ক্রিয়া করলেই সে নিজের মধ্যে থাকে না। উৎপাত উপদ্রব সব কিছু ঘোর থেকে এমনও মনে হল তার।

সে ঘড়ি দেখল। স্নানটান সেরে তাকে সেন্টারে যেতে হবে। বেশ দেরি হয়ে গেছে। সেন্টারে রুগির ভিড় বাড়ছে। এটা তার যশের জন্যও হতে পারে, সততার জন্যও হতে পারে। স্বভাবেই সে কাজে আন্তরিক। এমন নয় যে সে কাজপাগলা মানুষ—তবে কাজে ফাঁকি দিতে পারে না।

কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল ঈশানী—খাটের কাছে হেঁটে গেল—যেন ধরে না ফেললে পড়ে যাবে। সে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল। তারপর শুইয়ে দিয়ে চাদরে ঢেকে দিল।

কি হয়েছে তোমার? এমন করছ কেন? সে কিছুটা ভয়ই পেয়ে গেল।

আর তখন দেখছে ঈশানী তার হাত চেপে ধরেছে। চোখ

বিস্ফারিত। স্নিগ্ধ সুষমায় সারা মুখ উদ্ভাসিত। কোনো গোপন সুখে মগ্ন ঈশানী। ববি অ্যালবামের গুড এনাফ গানটি নরনারীর যৌন ইচ্ছের এক গভীর প্রতীক। সেই সুখে কি শরীর থেকে নির্গত হয় ভালবাসার উষ্ণতা। ঈশানী কি এ-ভাবেই রতিক্রিয়ায় সুখ পায়! এই সব গানে যৌনতার নানা উপকরণ থাকে—মানুষ যে-ভাবে পারে তার দৃশ্যাবলী থেকে সঙ্গমের ইচ্ছেকে পূর্ণ করতে পারে। একজন পুরুষ যা পারে না, গানে তার অধিক কিছু আছে এমনও ভাবল সুধাময়।

ঘোর কেটে যেতেই ঈশানী বোধহয় লজ্জায় চাদর টেনে মুখ ঢেকে দিল। কিন্তু সে সুধাময়ের হাত ছাড়ছে না।

সুধাময় খাটের কোনায় বসেই আছে। হাত ছাড়িয়ে নিতে পারছে না। তারপর চাদর সরিয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসল। হাত ছেড়ে টয়লেটে ঢুকে যাবার আগে হাতের ফুলগুলি সুধাময়ের হাতে দিয়ে দিল।

সুধাময় বোকা বনে গেছে। সে ফুল নিয়ে কি করবে বুঝতে পারছে না।

চোখে মুখে জল দিয়ে ঈশানী বের হয়ে এল। তার দিকে তাকাল ঈশানী—কোনো কুকাজ করে ফেলেছে বলে যেন ক্ষমা চাইছে।

সে না বলে পারল না, ঈশানী তুমি সত্যি ভাল নেই। আমি বুঝতেও পারছি না, কেন এটা তোমার হয়! এত সুখ থাকে এই গানে যে ঘোরে পড়ে যাও! কি হয়েছিল তোমার!

কিচ্ছু হয়নি।

তা হলে উঠতে পারছিলে না কেন। শরীর এত অবশ হয়ে যায় কি করে? গোপন অসুখ থেকে এ-সব হয়ে থাকে।

আমার অসুখ আছে বলছ।

আছে।

কি অসুখ।

এই অসুখের নাম জানা নেই আমার। আমি সাইকিয়াট্রিকও নই। তাঁরা হয়ত বলতে পারবেন। তোমার সব অদ্ভুত ইচ্ছেগুলো না থাকলে ভাল। বুঝতে পারি তুমি নিজেকে নিয়ে কি করবে ঠিক করতে পারছ না। তোমার এটাই অসুখ।

আমার অসুখ সারবে না?

সারবে।

কি করে?

ভালবাসলে সব অসুখ সেরে যায়।

এত সহজ !

এ মুহূর্তে আমার তাই মনে হচ্ছে ঈশানী। তুমি একটা গাছকেও ভালবাসতে পার। একটা কুকুরকেও। তোমার অনেক ইচ্ছে আছে, কিন্তু ভালবাসার ইচ্ছে নেই। না বাবা, না মাকে। কেউ তোমার প্রতীক্ষায় থাকলে, তুমি ভাল হয়ে যেতে।

সহসা কেন যে ক্ষেপে গেল ঈশানী। বাবা মার কথা উল্লেখ করায় হতে পারে কিংবা গাছকে ভালবাসতে বলায় হতে পারে—সে যাই হোক, ঈশানী প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, ওঠো, এক্ষুনি বের হও। বের হয়ে যাও। তিনি আমার উপর ডাক্তারি ফলাতে এসেছেন ! ডাক্তার ! বের করছি তোমার ডাক্তারি করা। মীরাদি, মীরাদি ডাক্তারকে চলে যেতে বল। এক্ষুনি। ওর জন্য এখন আমাকে একটা গাছকে ভালবাসতে-হবে !

সুধাময় হাসল। ঈশানীর অপমান গায়ে মাখল না।

তুমি আবার কবে চা খাওয়াচ্ছ বল।

কখনও খাওয়াব না। কখনও ডাকব না। আমি কুকুর, যে কুকুরকে ভালবাসব ! কুকুরকে তুমি ভালবাসতে পার না। রাস্তায় তো কত কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঈশানী ঠিক আসলে কী—বালিকা না যুবতী। নাকি দু-ই। বালিকার মতো অভিমানে ফেটে পড়ছে। কুকুরকে সে কিছুতেই ভালবাসতে পারে না। গাছকেও না। সে তাকে আর যেন চাও খাওয়াবে না জীবনে। যে তাকে এত খাটো করতে পারে তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কিসের।

আরে এ কি কাণ্ড ! ঈশানী বালিকার মতো সত্যি দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমাকে কেউ ভালবাসে না। কেউ না।

সুধাময় কিছুটা দমে গেল। কেউ কান্নাকটি করলে এমনিতেই তার ভাল লাগে না। এমন একটা সুন্দর মেয়ে কান্নাকাটি করলে খারাপ তো লাগবেই—কি করে যে ঈশানীকে সামলাবে, কেউ যদি এসে পড়ে, মীরাদি অবশ্যই আসতে পারে, অন্য কেউ যে আড়ালে সব কিছু লক্ষ করছে না তারই বা ঠিক কি—সে তার অপরাধের মাত্রাও ঠিক বুঝতে পারছে না, এ-ভাবে সামান্য কথায় কেউ ফুঁপিয়ে কাঁদতে পারে—তাও তার জানা নেই—কিছুটা সে বেকুবই হয়ে গেল।

সে সত্যি এখন পালাতে পারলে বাঁচে। এবং চোরের মতো পালাতে গিয়েই মীরাদির সঙ্গে দেখা। বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে

আছে।

মীরাদি সামান্য সরে দাঁড়াল তাকে দেখে। যাবার রাস্তা করে দিয়ে বলল, আপনাকে খুব জ্বালাবে। কিছু মনে করবেন না ডাক্তারবাবু।

না না মনে করার কি আছে। ছেলেমানুষ বলতে পারত। কিন্তু বলল না। ছেলেমানুষ বলা তার শোভা পায় না। সাজেও না। সে তো আর ঈশানীর গুরুজন নয়।

বাইরে বের হয়ে মনটা তার কেন যে এত খারাপ হয়ে গেল তাও বুঝল না। ঈশানীর জন্য আজই সে প্রথম বড় টান বোধ করল।

এও ভাবল, ওকে স্বাভাবিক করে তোলার দরকার। লজ্জা এবং সম্ভ্রমবোধ, রুচিবোধ সব থাকতেও কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম গণ্ডগোল আছে ঈশানীর। নিজ হাতে তাকে চা করে খাইয়ে কিছুটা সে আস্থা খুঁজে পেয়েছিল, গুড এনাফ গানটি না শুনলেই ভাল হত। নিদারুণ এই পপ সঙ্গীত ফের তাকে মনোরম ইচ্ছের জগতে নিয়ে গেছে—যা শুধু স্বপ্নেই সম্ভব— বাস্তবে এ-সব হয় না ঈশানী কিছুতেই বোধ হয় বুঝতে চায় না। মাঝে মাঝে ঈশানী স্বপ্ন আর বাস্তবকে গুলিয়ে ফেললেই গণ্ডগোলে পড়ে যায়।

তার দেরি হয়ে গেছে। বেশ জোরেই সাইকেল চালাচ্ছে। ইট সুরকির রাস্তা। দুটো গরুর গাড়ি আসছে। জোরে সাইকেল চালানো ঠিক হবে না। অপরিসর রাস্তা। সে সাইকেল থেকে নেমে গেল। গাড়ি দুটো চলে গেছে, পেছনে তাকাল—লাটুবাবুর বাড়িটা গাছপালার মাথা ভেদ করে উপরে উঠে গেছে— কেউ দাঁড়িয়ে আছে ছাদে। ঈশানী না বাড়ির অন্য কেউ এতদূর থেকে বোঝার উপায় নেই। এ-ভাবে দেখাও ঠিক না। যেই হোক— তার কাছে কেন জানি বাড়িটা এই শ্রীহীন পল্লীতে খুবই বেমানান মনে হল। আর এই সময়েই গরীব মানুষ আকালের কথা কেন যে মনে পড়ে গেল তার।

মাছ কটা রেইখে দ্যান বাবু।

আবার মাছ কেন।

আর কি দোব বাবু! আমি আকাল। কাঙ্গাল জ্বরে বেহুঁস। যদি দয়া করে ওষুধ দেন।

আমি যাচ্ছি। না দেখে তো ওষুধ দেওয়া যাবে না।

সেই প্রথম সে আকালের বাড়ি যায়। মাছ ফেরত নেয়নি আকাল। সেও পীড়াপীড়ি করেনি। তাজা কটা ট্যাংরা মাছ।

গরীবের নমুনা কতটা হতাশাজনক সে শহরে থেকে বুঝেছে। আকালের বাড়ি গিয়ে সেটা আরও বেশি টের পেল। কিছু সেমপল

ফাইল দিয়েছে। জ্বরটা ভোগাবে মনে হয়েছিল। কিন্তু গরীব মানুষের যা হয়, ওষুধ পেটে পড়তেই কাজে দিয়েছে। পিচাশিতলার থান বড় জাগ্রত। ঠাকুর চরণামৃত দিয়েছেন। ওষুধের সঙ্গে তাও খাইয়েছে। ফুল বেলপাতা রেখেছে শিয়রের নিচে। আরোগ্য লাভ ওষুধে না দেবীর চরণামৃত সেবনে আকাল ঠিক করতে পারেনি।

একদিন দেখা রাস্তায়। আকাল না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল। সে না ডেকে পারেনি।

তুমি আকাল না!

আজ্ঞে বাবু।

কাঙ্গাল কেমন আছে জানালে নাতো।

ভাল হয়ে গেছে। দেবীর খুবই কৃপা বাবু। ঠাকুরের আশিব্বাদ।

খবরটা দিতে হয়। সাবধানে রাখবে। বেশি ঘোরাঘুরি করতে বারণ করবে। কোথায় যাচ্ছ!

ঠাকুরের কাছে।

সুধাময় জানে, ঠাকুর পঞ্চতীর্থ এই সব নিঃস্ব মানুষের খুবই বড় সম্বল। ঠাকুর দেবতার কারবার করে মানুষটি সবার মাথায় বেশ জাঁকিয়ে বসে আছেন। লাটুবাবুও তাকে সমীহ করেন। মেলা বসবে, রুদ্র ভৈরবীর আবির্ভাব তিথি আসছে। পঞ্চতীর্থের বাড়িতেই দেবী দিগম্বরীর পূজার ব্যবস্থা করেছেন। বাড়িতে করলে কথা উঠতে পারে। সামিয়ানার নিচে বসে ঈশ্বর এবং প্রকৃতির লীলা বর্ণনা করেন ঠাকুর। সাঁজ লাগলেই আকালের মতো মানুষের ভিড় বাড়ে। এ-জন্মটা ঝরঝরে, পর জন্মে যদি কিছু হয়।

পণ্ডিতমশাই তাকে অন্তত একবার গিয়ে সামিয়ানার নিচে বসতে অনুরোধ করেছেন। ঠাকুরের কোপে পড়ে যাওয়া মানে পিচাশিতলার কোপে পড়ে যাওয়া। লাটুবাবুর মতো ব্যস্ত মানুষও বাদ যায়নি। তার জনসংযোগকারীরা দিনরাত খাটবে। জনগণের সেবা করছে।

সে যেতে পারেনি। যেতে ইচ্ছেও হয়নি। কাঁচাখেকো দেবীর কথা শুনেও তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়নি কেন বোঝে না। থান মাহাত্ম্য এতই প্রবল যে এবারও আবির্ভাব তিথিতে দ্বাদশ বৃক্ষে কেউ আত্মঘাতী হবে। এখানেই কেমন একটা খটকা—

সে কিছুতেই বিশ্বাস করেনি—এ হয় না।

হয় ডাক্তার, হয়।

না পণ্ডিতমশাই হয় না।

চেম্বার থেকে ফিরে এই হয়, হয় না বলেই তর্ক জুড়ে দিয়েছিল

সে। পণ্ডিতমশাই অকাট্য প্রমাণ দিয়ে নাম ধাম উল্লেখ করে, বছর তিথি উল্লেখ করে যখন বললেন, ঠাকুরের বিধানই বিধান, তোমার ভালোর জন্যই বলছি ডাক্তার, একবার যেয়ো। একবার গিয়ে সামিয়ানার নিচে গেঁদাফুলের মালাটি পড়ে বসে যাও। চামুণ্ডা সংকীর্তন হচ্ছে। হাত পেতে প্রসাদ নাও। কোপে পড়বে না। কে আত্মঘাতী হবে, কেউ জানে না। আমরা শুধু জানি থান মাহাত্ম্যে এটা হয়ে আসছে। জনগণের মঙ্গলের জন্য এটা হওয়া উচিত। কে যায় এখন দ্যাখো। দেবীর রোষ গাঁয়ের কার উপরে পড়বে কে জানে। আমি তুমি যে নই তাও বলা যায় না। সাবধানে থাকা ভাল।

শেষে সে বাধ্য ছেলের মতো বলেছিল, যাব।

যাব না, যেতে হবে। কেন শেষে বেঘোরে প্রাণটা দেবে।

এ আর এক উৎপাত, কখন যে যায়! অথচ যাওয়া দরকার। দেশাচার লোকাচারকে মানতেই হয়। সবাই যাচ্ছে, সে যাবে না এও ঠিক না। ঈশানী গেছে কি না জানে না। আজ সুযোগ ছিল, তবে ঈশানী যা ঘোরে পড়ে গেল তারপর আর কিছু বলাও যায় না।

তার ঘরটা ঢিবির মতো একটা উঁচু জায়গায়। সাইকেল ঠেলে তুলতে হয়। গুরুপদ তাকে দেখেই ছুটে এল। সাইকেল তুলে দেবার সময় বলল, ডাক্তারবাবু এটা আপনার ভাল কাজ হয়নি।

সুধাময় বলল, কি ভাল কাজ মন্দ কাজ বলছ।

সে ফিস ফিস করে বলল যেন দেয়ালেরও কান আছে, থান মাহাত্ম্য নিয়ে তর্ক করতে নাই। আমাদের লাটুবাবুকে নিয়ে তর্ক করতে নাই। আপনি কী সব বলেছেন, পণ্ডিতমশাই সারা গাঁ যজিয়েছে—ডাক্তারটা একটা ম্লেচ্ছ—দেশাচার লোকাচার মানে না। থান মাহাত্ম্য নিয়ে তর্ক করে।

লোকটাতো আচ্ছা ফিচেল! সে কেমন ক্ষেপে গেল। গুরুপদ সাইকেল তুলে এক কোনায় রেখে তাড়াতাড়ি উনুনের গরম জল বালতিতে ঢেলে দিল। গুরুপদ বোঝে তার দেরি হয়ে গেছে। খুবই বিশ্বাসী লোক এমনও মনে হয়েছে তার। তার সুবিধা অসুবিধা খুব বোঝে। গাঁয়ের মানুষ সম্পর্কেও, কে কেমন সতর্ক করে দেয়। পণ্ডিতমশাই লোকটি যে বেশি সুবিধার নয়, গুরুপদ বার বার তাকে বুঝিয়েছে। সে কি করবে! পড়তে বসলে বার বার চা না হলে তার চলে না। এই এক নেশা। পড়তে বসলে, কোনো মিউজিক অথবা গানের ক্যাসেটও সে চালিয়ে দেয়। বাইরের কোলাহল কানে আসে

না। গান বা মিউজিক বাজলে পড়ায় তার মনোযোগ বাড়ে। এমন কিছু বদভ্যাস তার ডাক্তারি পড়ার সময় থেকেই শুরু।

পণ্ডিতমশাই আসেন চা এর লোভে। পড়ার বারোটা বাজাতেও ওস্তাদ। গাঁয়ের এমন সব কেচ্ছা শুরু করেন যে কানে আঙুল দিতে পারলে ভাল হয়।

সে শুধু হুঁ হাঁ ছাড়া কোনো মন্তব্য করে না। সিনিয়র দাদাদের পরামর্শেই সে এটা করে। কেন যে বলতে গেল, এ হয় না। লোক কি তিথি নক্ষত্র দেখে কখনও আত্মহত্যা করে! লাটুবাবুর কেচ্ছাও বাদ দেয় না। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে কানের কাছে ফুস মন্তর ঝাড়ার মতো বলবে, এই হল লাটু। দেশের সেবক। বুঝলে ডাক্তার। বকাটে ছেলে, ব্যাক বেনচার এখন নেতা।

সে তাড়াতাড়ি দুটো মুখে দিয়ে সেন্টারে বের হয়ে গেল। তার সেন্টারটি গাঁয়ের শেষ মাথায়। কিছুটা ফাঁকা জমিনও পার হতে হয়। কিছু আকালের মতো মানুষের মাটির ঘরও পড়ে দু-পাশে। বাড়িঘরে মানুষজনের বিশেষ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কেমন খাঁ খাঁ করছে সব কিছু। সেন্টারে ঢুকে দেখল, রুগী নেই একটা। ফার্মাসিস্ট বাবু আসেন নি। কিছু গরু মোষ চরছে সেন্টারের মাঠে। সেন্টারের তালাও খোলা হয়নি।

চোখের সামনে ভয়াবহ এক কুশপুত্তলিকা ভেসে উঠল। বন্যপ্রাণীরা তাড়া খেয়ে ছুটছে। ধূপদীপ জ্বলছে, আরতি হচ্ছে, মানত পড়ছে, পাঁঠা বলি, যার যা মানত, আর ঠাকুর সামিয়ানার নিচে বসে ভৈরবী স্তোত্র পাঠ করছেন—নাভি থেকে মন্ত্রোচ্চারণে গম গম করছে গোটা পরিবেশ। গলায় রুদ্রাক্ষ মালা, কপালে রক্তচন্দনের তিলক, শিখাতে লাল জবা ফুল, চোখ কোটরাগত—এবং নিয়ত জ্বলছে। মন্ত্রোচ্চারণের ফাঁকে লোকটি বায়ু নিঃসরণে ডান পা তুলে দিচ্ছেন—এ দৃশ্যটাও তার চোখে ভেসে উঠল। গ্যাস্টিকের রুগি—অথচ কি তেজ! সে হা হা করে হেসে উঠল।

সে ফিরে এলে গুরুপদ বলল, কেউ যায়নি ত? যাবে না। একবার ভেবেছিলাম বলি, যাবেন না। কেউ পূজা ফেলে সেন্টারে যাবে না। আবার ভাবলাম, যাচ্ছেন যখন যান, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন—আমি বলে দোষের ভাগী হই কেন?

তুমি গেলে না?

আমার পরিবার গেছে। ছেলেমেয়েরা গেছে। ভোগের খাওয়া, ভাল মন্দ খেতে পাবে। আমিও যাব এক ফাঁকে।

তা হলে যাও। যাবার আগে এক কাপ চা করে দিয়ে যেও।

আপনি যাবেন না?

শরীরটা ভাল নেই। জ্বর মতো হয়েছে। শুয়ে থাকলে ভাল লাগবে।

তবু ঘুরে আসুন। ফেরার পথে ঠকুরবাড়ি হয়ে আসতে পারতেন। মুখ দেখালেই চলত।

ইচ্ছে করছে না।

আসলে সে কিছুটা জেদি হয়ে পড়ছে ভেতরে। কতদূরের খবর পৌঁছে গেছে গাঁয়ে, লাইট এসেছে, স্বচ্ছল মানুষদের ঘরে টিভি, মেট্রো চ্যানেল কত কিছু। অথচ মানুষ ধর্মের দাসত্ব থেকে নিস্তার পাচ্ছে না। এটা কেন যে হয়, কোথায় কোন মুল্লুকে নাচ গান হচ্ছে, ঘরে বসে তা দেখতে দেখতে মানুষের বোধোদয় হওয়াই স্বাভাবিক। এক বিন্দু তাকে নড়ানো যায়নি। বরং মানুষের এই বিজয় যত সহজ হয়ে যাচ্ছে তত মানুষ আরও বেশি ধর্মান্ধ হয়ে যাচ্ছে। তার খুবই খারাপ লাগছিল—সোজাসুজি সে কারো বিশ্বাসে আঘাত করতেও পারে না, তার ক্ষমতাও নেই—কোনোরকমে তিনটে বছর, তারপর রাহুমুক্তি—সে এ-সব ভেবে জামা প্যান্ট ছেড়ে পাজামা পাঞ্জাবি এবং লেপ গায়ে টেনে শুয়ে পড়ল।

গুরুপদ টিপয়ে চা রেখে গেছে। সে উঠে দরজা বন্ধ করে এসেনসিয়েল পেডিয়াট্রিকস বইটি টেনে নেবার সময়ই চোখে পড়ে গেল, রোল অফ ইনফেকশন শব্দ দুটি জ্বলজ্বল করছে। বইএর এক জায়গায়। সে আর পাতা উল্টোতে পারল না। কাত হয়ে চা খেতে খেতে বার বার শব্দ দুটির মধ্যে ঈশানীর সহজ সরল নিষ্পাপ দুটো চোখ দেখতে পেল। তার যে কি হল কে জানে, বই সরিয়ে লেপে মাথা ঢেকে অন্ধকারের মধ্যে আশ্চর্য এক আরামে ডুবে গেল। ঈশানী কি গেছে!

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। হেমন্তের বিকেল কখন শেষ হয়ে গেছে তাও জানে না। ঢাকের বাদ্যে তার ঘুম ভেঙে গেল। তার ঘরের ঠিক সামনেই ঢাক বাজছে। সে ধড়ফড় করে উঠে বসল, দরজা খুলে দেখল, দ্বাদশ এয়োতি, দ্বাদশ কুলোয়, দ্বাদশ ছাগমুণ্ডু নিয়ে পিচাশিতলার দিকে রওনা হয়েছে। কুলোর মধ্যে ধান দূর্বা, সিঁদুরের আলপনা এয়োতিদের পরনে লাল শালু, সারা গ্রাম উজাড় করে নারী পুরুষ ছাগমুণ্ডু নিয়ে রওনা হয়েছে পিচাশিতলায়। সামনে খড়ম পায়ে পট্টবস্ত্র পরে পঞ্চতীর্থ ঠাকুর ঘণ্টা নাড়তে নাড়তে পথ দেখিয়ে

চলছেন। আকাল রাস্তায় গঙ্গাজল ছড়িয়ে দিচ্ছে। দ্বাদশ ঢাকি ঢাক বাজাচ্ছে। যুবকেরা ধুনুচি নিয়ে নাচছে। যুবতীরা উলু দিচ্ছে। অরাজক উচ্ছৃঙ্খল মানুষের মিছিল দেখে সুধাময় ঘাবড়ে গেল। দ্বাদশ ছাগমুণ্ডু, দ্বাদশ বৃক্ষমূলে প্রোথিত করা হবে। রুদ্র ভৈরবীর কোপকে প্রশমিত করতেই ঠাকুরের এই বিধান।

অনেক মিছিল সুধাময় দেখেছে, কিন্তু এমন বীভৎস মানুষের মিছিল দেখে শরীরে সত্যি জোর পাচ্ছিল না। ডাঙা মতো জায়গায় এবং কিছু বাঁশের জঙ্গল তার ঘরটাকে আড়াল করে রেখেছে ঠিক, তবু সে কেন যে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। মিছিলটি না দেখলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। কৌতূহলই তাকে তাড়া করেছে। সে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে সবার আড়ালে মিছিলটি দেখে কেমন মনমরা হয়ে ফিরে এল।

সে কেন গেল!

কি দরকার ছিল যাওয়ার।

আসলে কৌতূহল। কিসের কৌতূহল! কৌতূহল না ভয়, না কোনো আতঙ্ক থেকে সে ছুটে গেছে দেখতে। মিছিলে ঈশানী নেই—কেবল ঈশানীই নেই। ছোটবংশী, লাটুবাবু, টুকি পিসি, মীরা সবাই আছে। কেবল ঈশানী আসেনি। ঈশানীও কি পালিয়ে ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। সেও কি বুঝতে চায়, মিছিলে ডাক্তার যোগ দিয়েছে কি না!

বলাই কেরানীর বাড়িটাও ফাঁকা। তার পুত্রবধূদের কলরব—কাচ্চাবাচ্চার ছোটাছুটি, মোটর বাইকের গর্জন, সবই স্তিমিত। সদর দরজায় দেখল বড় বড় সিঁদুরের ফোটা। কিছু শেওড়া গাছের ডাল, মটকিলার ডাল ঝুলছে।

গুরুপদও ফিরে এল শ্যাওড়ার ডাল নিয়ে। তার দরজায় ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, দেবী দিগম্বরী পক্ষ শুরু হয়ে গেল। ভূত পেত্নির বড় ছড়াছড়ি। জাগালদাররা মাঠে ডেঁড়িকুপি জ্বালিয়ে রাখে তরাসে। আগুন হলগে তেনাগ যম। আর এই শ্যাওড়ার ডাল—বিষে বিষক্ষয়।

সে কিছু বলল না। ঝুলিয়ে রাখছে রাখুক। গুরুপদ আসায় সে কিছুটা সাহসও যেন ফিরে পেয়েছে। গুরুপদর কাজ বিশেষ নেই। কিছু ফুট ফরমাস এই পর্যন্ত। আর রাতের খাবার দু'জনের মতো। এ-বেলারটা ওবেলা খাওয়া যায় না। বেশি হলে, গুরুপদ বাড়ি নিয়ে যায়। অবসর সময়ে সুতলির দড়ি পাকায়, এতেও তার দু-পয়সা আয়

হয়।

বাড়ির জন্য তার মন ক'দিন থেকেই বেশ আকুল হয়ে আছে। দু বার বাস পাল্টাতে হয়। বাসে বসার জায়গা পাওয়া যায় না। বড় হুজ্জোতি। টানা আট ন ঘণ্টা দাঁড়িয়ে বাস জার্নি সহ্যও হয় না। ইচ্ছে করলেই যাওয়াও যায় না। কি ভেবে আজ মাকে আবার চিঠি লিখতে বসে গেল—চিঠিটা শেষ হলে গুরুপদকে বলল, কাল সকালে পোস্ট করে দিও গুরুপদ। তারপর ইফফাত আরা খানের অতি প্রিয় ক্যাসেটটি চালিয়ে দিয়ে বুকের উপর বই রেখে শুয়ে পড়তেই আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল গুরুপদ।

'আমার হাত ধরে তুমি' গানটি শুরু হতেই সুধাময় চোখ বুজে ফেলল। তার কিছু ভাল লাগছিল না। এই গানের গাম্ভীর্য এবং স্নিগ্ধতা যেন কোনো কুল ছাপিয়ে তরঙ্গমালার মতো ভেসে আসছে। সে চোখ বুজে অধীর আগ্রহে শুনছে।

আমি কাননে কাননে—আঁহা ! তার চোখ থেকে দু ফোটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। ভিতরে কিসের এত তোলপাড়—সে বুঝতে পারছে না। তোমার তুলনা তুমি প্রাণ—গানটি শুরু হতেই সহসা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল গুরুপদ।

সাব শিগগির আসুন।

গুরুপদ যেন ভূত দেখেছে !

কি হল !

ফিস ফিস করে বলল, শিগগির আসুন। দেরি করবেন না !

সে গুরুপদর পেছনে পায়ে পায়ে ঘরের পিছনে হাজির। গুরুপদ টর্চ জ্বালতেই সে বিস্ময়ে হতবাক। ঈশানী। খড়ের গাদায় শুয়ে আছে চোখ বুজে। তাকে অপমান করে সে বোধ হয় ভাল ছিল না। অস্থির হয়ে চলে এসেছে চুপি চুপি। খড়ের গাদায় চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে আছে। এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় বাইরের প্রকৃতি যখন হিম হয়ে আছে—তখন ঈশানীর এই অদ্ভুত আচরণে সুধাময় বড়ই কাতর।

রেকর্ড প্লেয়ারে তখন গান হচ্ছে, এসো সোনার বরণ রানীগো/ রক্ত কমল করে/ এস মা লক্ষ্মী/ বসো মা লক্ষ্মী ঘরে... গানটির এই মাধুর্যে সারা প্রকৃতি যেন ডুবে যাচ্ছিল। দূরে দ্বাদশ বৃক্ষের নিচে হয়তো ছাগমুণ্ডু প্রোথিত হচ্ছে—ঢাক বাজছিল, মানুষের এই সৌন্দর্য এবং উপাসনা, অপরদিকে বীভৎস আচার অনুষ্ঠানের কদর্য আস্ফালনের মাঝখানে বুঝি ঈশানীর এই ঘোর।

সে ডাকল, ঈশানী।

সাড়া দিচ্ছে না।

সে হাঁটু গেড়ে বসল, মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিতেই, বড় বড় চোখে তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে না।

এই ওঠো। ঠাণ্ডায় যে মরে যাবে।

দাঁড়াও না। গানটা শুনতে দাও।

ঈশানী আবার চোখ বুজে ফেলল। সত্যি ঈশানী গানের মধ্যে কেমন তলিয়ে যাচ্ছে। সুধাময় নড়তে পারল না। টর্চ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঈশানীকে শুধু দেখছে—তার আর কিছু এখন করারও নেই। ঈশানী খড়ের গাদা থেকে না উঠলে সে এখান থেকে নড়তে পারছে না।

॥ সাত ॥

রোজ রোজ আগুন নিয়ে মারামারি আর কাঁহাতক সহ্য হয়। আজও আগুনের হাতাখানা বুড়ি শাউড়ি লুকিয়ে রেখেছে।

হাওয়ায় ডেঁড়িকুপিও নিভে গেছে। শুধু উঠোনে জোছনা। সারা উঠোনে জোছনা। নারকেল গাছে জোছনা হাওয়ায় দোলে। উঠোনে গাছের ছায়া নড়েচড়ে বেড়ায়। আকাল ঘরে ঢুকে ডাকে, অ মা, মা রে!

বুড়ি খেঁতার নিচ থেকে বলে, আমার আকাল! কি কথা!

খেঁতার নিচে বুড়ি আলসে নিয়ে শুয়ে আছে। শরীর তবু গরম হচ্ছে না। বুড়ি কুঁই কুঁই করছে।

আমার একখানা কম্বল লাগেরে বাপ। ঠাণ্ডা যেইছে না। মরে যাব বাপ। ও হো হো!

শীতের কাপুনি বুড়িকে ঝাঁকাচ্ছে।

হাতাখানা রাখলি কুথি?

আছে। কাঁথা থেকে মুখ বার করে ফিস ফিস করে বলল, বউ আখার পাড়ে?

না।

আমারে আর দু-হাতা দে বাপ। তুষ জ্বলছে না।

আর হবে না।

দে বাপ। দু হাতা আগুন দিলে পরমায়ু বাড়বে বাপ।

রাগ করবে তুর বউ।

ময়নার বুড়ি শাউড়ি উঠে বসে। কাঁথার নিচ থেকে হাত বের

করে আলসের মধ্যেই হাত ঢুকিয়ে দেয়। দু হাতা তুষ, এক হাতা আগুন দে না বাপ। পায়ে পড়ি। মরে গেলে তুরে দেখবে কে ?

আকালের ভয় বুড়ি না আবার এই সুমার রাতে বিলাপ জুড়ে দেয়।

আগুন নিয়ে এত ভাগাভাগি আকালের সহ্য হয় না। সে বলল, বউ ঘরে যাক। দু-হাতা তুষ দিয়ে যাব। কেউ টের পাবে না।

ও বাপ বেঁচে থাক। শতায়ু হ বাপ। শত পুত্রের বাপ হ। ধনে জনে বাড়ুক। তুর পুন্যি হবে বাপ। আমি তুর মা ভুইলে যাস ক্যানে। দশমাস পেটে বয়ে বেড়িয়েছি। আমি না থাকলে তুর বউ সোয়ামি কোথায় পেতরে বাপ।

আকাল জানে ঘরে থাকলেই হাজার রকমের কথা কবে বুড়ি। বুড়ির কথার শেষ নেই। সে অন্ধকারে হাতড়ে মাটির হাতাটা পেয়ে গেল। বুড়ি রোজকার মতো পালিয়ে রেখেছিল, ফাঁক বুঝে আড়ালে কিছু তুষ আর আগুন চুরি করবে বলে। হাতাটা তুলে নিতেই আকালের মনটা খারাপ হয়ে গেল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতাটা খুঁজেই পাবে না। সারারাত শীতে কুঁই কুঁই করবে।

ময়না তো মেয়েছেলে না—দজ্জাল যারে কয়। বউ না বললে সে দুহাতা আগুনও আখা থেকে তুলতে পারে না। টের পেলেই বউ বাড়ি মাথায় করবে। আগুন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লে রক্ষা থাকবে না। আর বউ আগুন তুলে নিলে আখায় ছিটে-ফোঁটাও পড়ে থাকবে না। তখন হবে মরণ। মাটা সারারাত কেবল চিল্লাবে।

সে বলল, ও বউ !

ময়না তখন ডোবা থেকে থালা বাসন ধুয়ে উঠে আসছে। গায়ে ছেঁড়া শাড়িখানা প্যাচিয়ে শীত নিবারণ করছে। কাজে কামে লেপ্টে থাকলেও শীত কম থাকে।

সে আবার ডাকল, বউ, বউরে !

ময়না ফিরে তাকাল।

মা আর দু-হাতা আগুন চাইছে। দু-খাবলা তুষ।

আর কি চায় তোমার মা ?

না ওই। দেই।

না। দিলে থাকবেটা কি। আমার বাছাদের গরম ধরবে কিসে ? সব টাল মেরে আছে। বাছারা ঠাণ্ডায় কুঁকড়ে আছে বোঝ না !

আকাল বলল, মা হলেন জননী, ধরিত্রী। তারে অবহেলা করতে নাই। যা টাল।

ময়নার কি মনে হল কে জানে। তার নিজের মালসায় আগুন তুলে বলল, লিয়ে এইস। দু হাতার বেশি না।

সে এক দৌড়ে মার ঘর থেকে আলসে বের করে আনল। গোলা আছে, তবে ধান থাকে না। তুষ থাকে। আকাল উবু হয়ে দু খাবলা তুষ তুলে আখার কাছে নিয়ে দু-হাতে ধরে রাখল আলসেটা। আগুন পড়তেই শরীরে তাত লাগছে। বড় ওম। ময়না শেষ আগুনটুকু আখা থেকে তুলে ঘরে ঢুকে গেল। মাচানের নিচে ঢুকিয়ে দিতেই কাঁথা বালিস মাচান সব উষ্ণ হয়ে উঠতে থাকল। শেষে মশারি তুলতে গিয়ে অবাক। তার পাশের বালিসে ছুটকি নেই। আকালের গরম ধরলেই এই কুঅভ্যাস। রোজকার মতো মরদের এই কু-কাজে সে চটে লাল। মেঝে থেকে ছুটকিকে তুলে এনে ধপাস করে ফেলে দিল।

রস জেগেছে। বের করছি রস। সব ঘরে, রস মরে নাগ!

আকাল আর পারে! সে হাত চেপে ধরল ময়নার।

হাত ছাড়।

লক্ষ্মী তুই আমার। সোনাবউ লক্ষ্মীবউ বলে জড়িয়ে ধরতে চাইলে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল আকালকে।

আজও সরেস জমির খোঁজে ছিল আকাল। ময়নার ঝাড় খেয়ে সব গরম তার জল হয়ে গেল।

ময়না মশারি তুলে ঢুকে গেল। শরীর টান করে শুল। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বের হবে। আকাল অবশ্য ঘুমায় না। মেঝেতে শুয়ে থাকে ঠিক, জেগেও থাকে।

মাঠে যেছি বললে, বলবে, ধরা পড়ে যাবি বউ। যাস না।

সে আমি বুঝব। ঝাঁপ টেইনে দাও।

আমিও তবে যাই। মরণ হলে দু-জনার একসঙ্গে—ভাল কথা, যদি বলিস বাগানে গিয়ে বসে থাকি। কাঠাখান ভরে গেলে দিবি। মাথায় করে নিয়ে আসব।

বউর এক রা। —না!

ক্যানে না।

তুই পুরুষমানুষ। ধরা পড়লে। জেল হাজত।

তা বউ বুদ্ধি ধরে। কিন্তু আজ তার আশায় ছাই দিয়ে বউ বগলে কাঠাখানা নিয়ে বের হতেই মহাখাপ্পা।

মাঠে জোছনা। আকাশ নীল! বসুন্ধরা নিশুতি রাতে বাক্যহারা। শুধু কীটপতঙ্গের আওয়াজ। দূরে শেয়ালের হাঁক। সারা মাঠ জুড়ে

সোনালি ধানের খেত। দেবী দিগম্বরীর পূজা ষোড়শোপচারে। সে সারা রাস্তায় গঙ্গাজল ছিটিয়েছে। ঢাকিরা ঢাক বাজিয়েছে। গুষ্ঠিসুদ্ধু সারাদিন পড়ে থেকেছে ঠাকুর বাড়িতে। জবাফুলের মালা গেঁথেছে ময়না। সেই মালা সে পাঁঠার গলায় পরিয়ে দিয়েছে। ঠাকুর তাকে কাঠ চেলা করতে দেননি। তার যোগ উপস্থিত হলেই ডেকে পাঠাবেন। কবে যে হবে! সে সারাদিন ঠাকুরের চোখে পড়ার জন্য ঘোরাঘুরি করেছে। ঠাকুর শিবনেত্র হয়ে সেই যে পূজায় বসে গেলেন, তাকে লক্ষই করলেন না। আফশোষ। শেষে কি করে! মাথায় ঘড়া নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। ঠাকুরের সামনে হেঁটেছে। আর ঘড়া থেকে জল ছিটিয়েও ঠাকুরের মন ভজাতে পারেনি।

যার সামনে রাজযোগ, তার বউ কাঠা কাঁখে ধান চুরি করতে যাচ্ছে—সহ্য হয়! আসলে নেশা। বউর নেশা ধরে গেছে। ফির সালে একটা মাস ধানের জমিতে হেঁটে বেড়ানো নিশীথে—নেশা। শিশিরে পা ভিজে যায়। ঘাস পাতা লেগে থাকে। বউ জোছ্নায় যেন ধানের জমিতে উড়ে বেড়ায়। সে দূর থেকে দেখে। সঙ্গে যেতে সাহস পায় না।

বউকে তার তখন বউ মনে হয় না। কেমন এক মায়াবী পৃথিবীতে বউ তার ভিন্নগ্রহের জীব হয়ে যায়।

জাগালদাররা দূরে দেখতে পায় এক নারী মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। অবশ্য সবাই দেখে না। কেউ দেখে, কেউ দেখে না। কোনও সালে কথা ওড়াউড়ি হয়, কোনও সালে হয় না। জোছ্নায় নারীর এমন রহস্যময় ভ্রমণ কোনও অলৌকিক কাণ্ড কারখানা মনে হয়। তখন তারা যে হাঁকবে, কে মাঠে জাগে, তাও পারে না। ভয়ে কাবু। দূরে তখন পিচাশিতলার দ্বাদশ বৃক্ষও যেন উড়তে শুরু করে দেয়।

জাগালদাররা ডেঁড়িকুপি জ্বালিয়ে বসে থাকে। আগুনের সামনে থেকে কেউ নড়ে না। ছাউনিতে বসে যে যার মতো ইষ্টনাম জপ করতে থাকে। ডেরা থেকে কেউ মুখ বার করতে সাহস পায় না।

সারা মাঠে বিচরণ করে বেড়ালে একরকমের, ধানের ছড়া তুললে একরকমের। এবারে কি হয়েছে কে জানে, শুধু লাটুবাবুর জমিতেই বিচরণ করছে ময়না। বেশি দূরে যাচ্ছে না। ছোটবংশীকে পাগল না করে ছাড়ছে না। দ্যাখ কে খায় ধান! পোকামাকড়ে খায়! না মনুষ্যে খায়।

মাঝে মাঝে হাঁক আসে মাঠ পার হয়ে। ডেরার ভিতর বসে কাঁথা

কম্বলে মুখ ঢেকে জাগালদাররা হাঁকে—

কে জাগে ?

রাক্কসের ভাই খোক্কস জাগে।

তুমি কোন রাক্কসের খোক্কস।

আমি লাটুবাবু রাক্কসের খোক্কস।

তুমি কোন খোক্কস ?

আমি দাশু করের।

আর কোন খোক্কস জাগে।

জাগে এক খোক্কস, নাম তার ছোটবংশী।

এইসব ঐশী কথাবার্তা কখন যে এলাকার মানুষের মধ্যে তড়পে ওঠে, কখন যে অলৌকিক ভ্রমণে রত নারী দেব-দেবী হয়ে যায়—পরে এসবই লৌকিক গাথা হয়ে যায়। ফসল উঠে গেলে দেবীর পূজা হয়— তখন আকাল ভেবেই পায় না, ময়না, না আর কেউ! কিংবা পিচাশিতলা থেকে কারও আগমন কি না, তাও সে বুঝে পায় না। সে তো দেখে নিরন্তর এক নারী জীবন পণ করে তার বাচ্ছাদের অন্নকষ্ট দূর করার জন্য নিশীথে মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে দেবী হতে যাবে কেন! কাঠাখানা ভর্তি হলেই ময়না চুপি চুপি মাঠ থেকে উঠে আসে পালিয়ে। ময়না জোছনায় ভেসে বেড়াবে সে কী করে হয়!

ফসল উঠে গেলেই দেবীর নামে পূজা শুরু ঘরে ঘরে। যে যেমন পারে। লাটুবাবু পট্টবস্ত্র পরেন। দেশাচার না মেনেও উপায় থাকে না তার। হয়ে আসছে কবে থেকে। এত দেবদেবী নিয়ে আর পারাও যায় না! লাটুবাবু তবু ফসলের দেবীকে অমান্য করতে পারেন না। দশজন ঢাকি আসে। পুরুতমশাই মন্ত্র আউড়ে যান। গণেশের পূজা, পঞ্চদেবতার পূজা, মাঠের দেবীর পূজা, পাঁঠাবলি, কাঙ্গালী ভোজন—কত কী! আকাল, ময়না, তাদের ছানাপোনা, বুড়ি শাউড়ি সেদিনটায় রাস্তার ধারে বসে থাকে। লাটুবাবু জোতদার মানুষ। গঞ্জেও আড়ত, পঞ্চায়েতের প্রধান, মানুষজন সব তার অনুগ্রহভাজন—সবাইকে সেদিন লাটুবাবু তুষ্ট করেন।

খুদু কর্মকার, লাটুবাবুর এক নম্বরের চেলা জলচকিতে বসে বিড়ি ফুকবে আর লাটুবাবুর বিপাকের কথা বলবে।

লাটু কী করে! লাটুর ঘাড়ে কটা মাথা আছে লাটু করবে! জনগণের মঙ্গলের জন্য লাটুকে করতেই হয়। তার কি দোষ।

পাঁঠার মাংস ভাত। আসলে ফিস্টি খুদু কর্মকারের কথায়। ভাত

খাও, মাংস খাও। খাওয়াটাই সব। দেব দেবী উপলক্ষ মাত্র। পাঁঠার মাংস ভাত পেট ভরে। কাঙ্গাল ভোজনের সময় লাটুবাবু নিজে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে থাকেন। ময়না মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসে থাকে।

বাবু জোড়হাতে ময়নার সামনে এসে দাঁড়াবে।

খাও, আকালের বউ পেট ভরে খাও। লজ্জা কি। খাও, খাও।

আকাল অবাক ! এক সালে ময়না পাঁঠার মাংস ভাত খেয়েই হড় হড় করে বমি তুলে দিয়েছিল। আকাল অবাক। সবাই অবাক। আকালের বউ দেবীর প্রসাদ খেয়ে হড় হড় করে বমি করল কেন ? দেবীর কোপ কি তবে এ গাঁয়ে পড়বে। আর ঠিক পরের সালেই দেখা গেল—খরা, অনাবৃষ্টি। জমি উরাট। ফসল নেই মাঠে। মাঠ খা খা করছে। ছাউনি পড়েনি। জাগালদার জেগে নেই। মাঠের দেবী আবির্ভূতা হলেন না।

সেবারে লাটুবাবু দশটা পাঁঠা মানত করলেন। দশফুট উঁচু দেবীর মূর্তি এল। ষোড়শোপচারে পূজা। তিন দিন ধরে কাঙ্গালী ভোজন। সেই লাটুবাবু এখন আর নিজে পূজা করেন না—করেন বাবুর পরিবার। পরিবারের নামে সব পূজা আর্চা হয়। লাটুবাবু শুধু তার দেখভাল করেন। যা লাগে তাই কিনে দেন। খরচপত্র সব তার। পূজা পরিবারের। ছোটবংশীর হাঁকডাক বাড়ে। বাড়ির মচ্ছবে কীর্তনে খোল বাজায়। যাত্রা গানের আসরে ছোটবংশী না থাকলে সামলানো দায়।

হাতে লাঠি, মাথায় ফেটি বেঁধে সে লোকজনকে বসিয়ে দেয় আসরে। ময়নাকে দেখলেই আসরের সামনে নিয়ে বসাবে। বলবে, বস এখানটায়। কাঙ্গাল, আকাল, ছুটকি, বড়কি, বুড়িশাউড়ির তখন কত সমাদর। পানের খিলি এনে দেবে। চানাচুর বাদাম কিনে দেবে—সে এক মহা ময়ফেল।

সেই মানুষটাকে ময়না নানা কিসিমেও ভজাতে পারছে না। তুষের আগুনে ময়না ধিকি ধিকি জ্বলছে, ফাঁক ফোঁকড়ে আকাল সুযোগ পেলেই হাত সেঁকে নিচ্ছে। এই একটা লাভ ছোটবংশীর দৌলতে তার আছে।

ছোটবংশীর এক কথা, না পাপ হবে। পাপ হলগে সাপের গর্ত। হাত দিলে ছোবল খেতে হবে। রাবণ রাজারে দ্যাখলি না। সীতা হরণে স্বর্ণলঙ্কা ছারখার। তোরে ছুঁলে আমার পোষ্য পরিবার ছারেখারে যাবে।

শাস্ত্রের বচন সে বড় মান্য করে। এ জনমটা তার গোলামি করে কেটে গেল। পরের জন্মে তার সুখ দেখে কে।

তার এক কথা।

সব কর্মফল ময়না। বাড়াবাড়ি করতে যাস না। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর, ধরায় অবতীর্ণ হলি, কত পুণ্যফলে—পাপ আর বাড়াস না। বাড়ালে পরের জন্মে পোকামাকড় হবি।

ময়না ছোটবংশীর কথায় পেরে না উঠলে তুই তুকারি শুরু করে দেয়।

তুই লাটুবাবুর লাট নিয়ে মজে থাকলি, নিজেরটা দেখলি না!

আমার কি আছে। আমার দিন চলে যেইছে। এক জন্মে সব হয় না। চৌরাশি যোজন ঘুরে মনুষ্য জন্ম। তারে পাপে তাপে ডোবাতে নাই—ডোবালেই ফের পোকামাকড়।

ময়না এই করে পনের সাল পার করে দিয়েছে। বচসা হয়। গ্রাম জায়গা। ঝোপ জঙ্গল, বাগান মাঠ, দূরে পিচাশিতলা, মসজিদের পাশে লম্বা খাল, আরও দূরে দ্বাদশ বৃক্ষ, কবরস্থান, বাঁশের জঙ্গল—এখানে সেখানে ছোটবংশীর সঙ্গে দেখা হয়েই যায়। দেখা হয়ে গেলেই সে তার ক্ষোভ জ্বালা সব উগড়ে দেয়।

ছোটবংশী জাগালে গেছে ঠিক টের পেয়ে গেছে ময়না।

শীত না নামতেই এই হাল। ছোটবংশী কাঁথাখানা গায়ে দিয়ে ডেরার মুখে বসে। সেই পারে পোকামাকড় ইঁদুর বাদুড় থেকে ধানের ছড়া খালাস করতে। জমির উপর দূরে দূরে টিনের ঘণ্টা। ডেরার বাতা থেকে দড়ি ঝোলানো। দূরে বাঁশের ডগায় টিনের খোক্কস। দড়ি টানলেই টিনে ডংকা বাজে। টিনে ডংকা বাজলেই ভড়কে যায় সব পোকামাকড়। ইঁদুর গর্তে লুকায়। বাদুড় উড়তে থাকে। খরগোসের পাল লাফিয়ে জমি পার হয়। নিশুতি রাত জেগে তার এখন শুধু এই এক কারবার।

সে ডংকা বাজালেই মাঠের সব খোক্কস এক লগে জেগে যায়। যেন খালে বিলে ঢাকিরা ঢাক বাজায়। টিনের ঢন ঢন আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার মতো। গাঁয়ের লোকেরা টের পায় মাঠে জাগালদাররা ডংকা বাজাচ্ছে। রাক্ষসের ভাই খোক্কস জেগে উঠেছে।

তুই ব্যাটা ইঁদুরের কাণ্ড বলিস, আওয়াজ পাস না। ইঁদুর জমিনে হাঁটাহাটি করে টের পাস না।

টের পাই কর্তা।

তবে !

ডংকা বাজাই। নড়ে না।

ইঁদুরের এত সাহস !

যা দিনকাল কর্তা, কেউ খায়, কেউ খায় না। খেতে না পেলে করে কি ! জীবের পরাণ বলে কথা। পরাণ রক্ষা বলে কথা। সাহস হবে না ক্যানে ?

খুব দেখছি বুঝদার হয়েছিস। হ্যারে খেলেই হল। খেলেই চলবে। খেলে তুর আর কাম কি !

ছোটবংশী বোঝে ঠিক। খেলে আর তার কাম কি। সে তো আছে এখান সেখান থেকে সব খুটে খুটে তুলে আনবে বাবুর। বাবুর বিশাল মহাজনী কারবার—বাস মিনিবাস, আড়ত, জমিজমা, পঞ্চায়েতি, মনুষ্যগণের জন্য দিনরাত অফিস কাচারি, ভটভটিয়ায় চড়ে কোথায় কোথায় চলে যান, মিছিল করেন, মিটিং করেন, সে আছে বলেই তো সব। না থাকলে বাবুর শোভা থাকে না। ইজ্জত থাকে না। কন্যেটি বড় হচ্ছে। তারেই শুধু সামলাতে পারে না। কেবল নাকি ইচ্ছে হয়। কি যে ইচ্ছে হয়, তাও বোঝে না। যখন তখন ঝুটঝামেলা বাঁধাতে ওস্তাদ। চামুণ্ডার থানে নিশুতি রাতে নাচানাচিও করেছে। পঞ্চতীর্থ খুবই কুপিত।

মাথায় পোকা আছে দিদির। তা না হলে ঘণ্টাকর্ণ পলাশপত্র আনতে নিশুতি রাতে কেউ পিচাশিতলায় যায় ! ভয় ডর থাকবে না ! বছরটাও ভাল না। দিগম্বরীর পূজা হয়ে গেল সাড়ম্বরে। দ্বাদশ বৃক্ষের নামে, দ্বাদশ পাঠাঁবলিও হয়ে গেল। রক্ত মাখামাখি কপালে—কে যায় এখন শুধু দেখার। থান মাহাত্ম্য বলে কথা। তার অত দেখার সময় কোথায়। সে শুধু জোড়হাত করে থাকতে শিখেছে। বাবুর গরু বাছুর, জমিজমা, মুনিষ, বাদলা দিনে ঘাস কাটা গরুর গাড়ি হাঁকিয়ে আড়ত—সারা দিনমান কাজ। রেতের বেলা, গোয়ালে গরু মোষ তোলা, আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া—মশা মাছির বড় উৎপাত।

ডাঁশ উড়ে বেড়ায়। রক্তচোষা জীব। বংশী ফটাস করে গায়ে একটা চাপড় মারল। মশার কামড়ের জ্বালায় সারা গায়ে কেরোসিন তেল মেখে জাগালে এয়েছে। তেলে মাতাল দিচ্ছে না। ক্ষুধা। ক্ষুধা। বড় আহাম্মকি কারবার। নিজের ভালমন্দ বোঝে না। মরণের ভয় পর্যন্ত থাকে না !

গেলি ত ! জীবন নাশ বোঝ।

সে ডেঁড়িকুপির আলোতে হাত মেলে দেখল—রক্তপাত।

শালোর ক্ষুধা বোঝ এবার। চেটোর মধ্যে চ্যাপ্টে আছিস। জন্মালে কিন্তু উড়ে বেড়াতে পারলে না। শালো ক্ষুধার জ্বালায় মলে। আমার দোষ নিও না। হুলের জ্বালা বড় জ্বালা। তা তুমি শালো রক্ত চুষে খাবে আর আমি বেজন্মার বাচ্চা সব সয়ে যাব। ভাবছোটা কি!

আবার মশা। মশার বড় উৎপাত। উৎপাত সেই সহ্য করতে পারে না। লাটুবাবু পারবে কেন। কত বড় মানুষ বুঝলি না পঞ্চা। এত করে বললাম দে লিখে। দাম পাবি। বাবুর ইচ্ছে জমিতে পাটের আড়ত করে। বাবু তো করে না। করে উপরয়ালা। উপরের নির্দেশ এয়েছে, জমিখানা চাই। লড়ালড়ি শুরু করলি, কোর্ট কাছারি—কি হল, ঘণ্টা। কে সাক্ষী দিল। দিল কেউ! জোর খাটাতে গেলি। উপরের নির্দেশে খতম হয়ে গেলি। অঙ্গুলি হেলন বুঝলি না। পোকামাকড় খায়। কেন খাবে। ইঁদুরে খায়, কেন খাবে! তার বেলায় কেন খাবে? তোর বেলায় সব হজম। নিধন যজ্ঞ শুরু হল বলে। কীটপতঙ্গ থেকে শেয়াল খটাস কিছু আর থাকবে নারে পঞ্চা। বাবুর মর্জিই সব। কে থাকবে, কে যাবে। শুনছি থানে দিদি উঠে নাকি জুতো পরে নাচানাচি করেছে। ঠাকুর কুপিত। এখন কার কোপ কার ঘাড়ে পড়ে দ্যাখ। তুই তো মজায় আছিস। হাওয়ায় উড়ে বেড়াস, ঘুরে বেড়াস। লড়ালড়ির সবটাই তুই দেখতে পাবি। আমরা কিছুটা।

ঠাকুর, দেবতা, চামুণ্ডার থান এক পক্ষ। আর এক পক্ষ কে? লাটুবাবু? দিদিমণি! না অন্য কেউ। ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়ালড়ি। ছোটবংশীর হাসি পেল।

সে পিচাশিতলার দিকে কেন যে হাতজোড় করে বসে থাকল, জানে না।

ঠাকুর না থাকলে লাটুবাবুও থাকে না। ঠাকুর কুপিত হলে তার যে সব যায়। হাড়িকাঠখানা দাঁড়িয়ে আছে। মানুষ শেয়াল খটাস, পাঁঠা মোষ যা পাও বলি দাও। থান মাহাত্ম্যে গলায় দড়ি ঝুলুক। লাটুবাবু টুঁ শব্দটি করবেন না। তাঁর তখন এক কথা, সবই উপরের নির্দেশে হচ্ছে। ঢাক বাজলেও উপরের নির্দেশ, না বাজলেও। তিনি শুধু বাস্তুঠাকুর। তিনি তখন সব দেখতে পান, শুনতে পান, কিছু বলতে পারেন না। উপরের নির্দেশ না এলে তাঁর কিছু বলারও নেই।

এত বিপরীত চিন্তা ভাল না। সে আছে জাগালে, তার কি কাম এসব বিপরীত চিন্তা ভাবনায় ডুবে যাওয়ার। তার চেয়ে সারা গায়ে কাঁথা জড়িয়ে জবু থবু হয়ে বসে থাকা ভাল। মুখখান বাদে আর কিছু দেখা যায় না। মাঝে মধ্যে জমিতে সর সর শব্দ উঠলেই ডংকা বাজাতে শুরু করে। বিপরীত চিন্তা মাথা থেকে সরে না বলেই সে গান ধরে—কোন ঘাটের জল তুলবি বলে ঘাঘর তুলে মলি, ও ময়নারে পরাণ ত আর সয় না। লাটুবাবু যে তার অন্নদাতা ময়নার যদি সেই হুঁস থাকত। মাঝে মাঝে ময়নার কথা ভাবলে তার শরীর অবশ্য অবশ লাগে। মিছে কথা বললে পাপ হয়। ময়নাকে দেখলে বেঁচে থাকার যুস পায়। তবে পরস্ত্রী বলে কথা। পরস্ত্রী হলগে জননী, শাস্ত্রে লেখা আছে।

ময়নাকে দেখতে পাবে বলে ঘুরপথে জমিতে আসে। ময়না দাদা দাদা করে। রঙ্গরসিকতা করে। এবং সে কতবার দেখেছে, ময়না গাছে হেলান দিয়ে বুকের কাপড় পর্যন্ত সরিয়ে দিয়েছে।

দৃশ্যটা দেখলে তার বুক কাঁপে, কেমন অবুঝ হয়ে ওঠে। তুই আকালের অগ্নিসাক্ষী করা বউ। তু নষ্ট হয়ে গেলে সমাজ তুকে কুলটা বলবে। দৃশ্যটা দেখলে তার হাড় পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে যায়। হাঁটুতে বল থাকে না। ময়না দু-হাতে শাড়ি তুলছে ত তুলছেই। তখন আর কি করা—আহাম্মকের মতো হা হা করে না হেসে পারে না। যেন এসবের সে কিছু বোঝে না। শুধু পালাবার সময় তার এক কথা—ময়না তুর শরীরে গরম ধরেছে। মাঠে ঘুরে আয় না হয় গাছতলায় বসে থাক। হাওয়া পাবি। শরীর ঠাণ্ডা হবে। সব গরম উবে যাবে।

যুবতী নারী ক্ষেপে গেলে যা হয়, ছোটবংশী বোঝে না, ময়না কেন পাগলের মতো ছুটে আসে তার কাছে।

তুর মুখে থু।

ময়না তার মুখে থুথু ছিটিয়ে দৌড়ে পালায়। পালাবার সময় কেমন বেহুঁশ রমণী—আবোল তাবোল বকে।

আমার শরীল ঠাণ্ডা হবে। শরীল নাই যার তার আবার ঠাণ্ডা। আকাল শরীলের সবটা খেয়েছে। তু আর ফু দিবি না। দেখবি কোনদিন গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছি।

রাতে ডেরায় জেগে থাকলেই যত রাজ্যের কু-চিন্তা মাথায় নড়চড়া করতে থাকে। কী করে। কাঁথাখান গায়ে জড়িয়েও শীত যাচ্ছে না। সব বরফ। আলে আলে হেঁটে বেড়ালে হয়। শরীর তবে গরম

হবে।

কেউ কোথাও নেই। কে তবে চুরি করে। ডগা থেকে ধান কেটে লেয়। সেই দেবীর সাক্ষাৎ না আবার হয়ে যায়। মাঠের মাঝে দেবী না আবার ভেসে ওঠেন। দেবীর আবির্ভাব কখন হয় কেউ জানেও না। দেবীর সামনে পড়ে গেলে নির্ঘাত আগুন ধরে যাবে গায়ে। ডরও কম না।

কিন্তু মাথায় পোকা নড়ছে।

ওরে ধান মনুষ্যে খায়। চোখ মেলে দ্যাখ।

এরপর আর মাথায় পোকা না নড়ে পারে। মনুষ্যকুলের কেউ নড়াচড়া করলেই তেড়ে যাবে। দেবী হোক যক্ষ রক্ষ হোক নিস্তার নাই। বেইমানি সে জানে না। দেবীর গোঁসা হলে বলবে আমার দোষ লিবেন না। ক্ষমা করে দ্যান মা জননী। আমি জাগালদার। আমার কাম বাবুর হয়ে ফসল রক্ষা করা। ইঁদুর বাদুড় তাড়ানো। মনুষ্যকুলের কেউ এলে পিছু ধাওয়া করা।

আপনি যে মনুষ্যরূপিনী দেবী কী করে বুঝব! আবাল মানুষের দোষ লিবেন না। বাবুর বছরকার বান্দা। কর্তা আমার উপর নির্ভর কইরে থাকে। জমি থেকে শস্য চুরি যায় মাঠান। আপনি ত্রিলোকের খবর রাখেন—অধমরে কয়ে যান কোন মনুষ্য চুরি করে লিচ্ছে। আপনার শ্রীচরণের দাস। কোনো বর চাইনে মাঠান—শুধু যেন নেমকহারাম না হই। মাথায় হাত রেখে সেই ভরসা দ্যান।

তা মাঠান মনে কিছু ধইরে লেবেন না। এটাই আমার গরব। এটাই আমার সম্বল। কর্তা নিজেই কয়—ছোটবংশী আছে না! তার চোখকে ফাঁকি দেবে কে! কর্তার কত কাম, এর ওর নালিশ, জমির সীমানা ঠিক করা—এক দণ্ড বসে থাকে না। তার কন্যে বড় বিপরীত। কি মানুষের কি কপাল!

তা মাঠান কর্তা আর একখানা কথা হামেশাই কয়ে থাকেন। ছোটবংশী বড়ই আস্থাভাজন। অত বড় কথার মর্ম বুঝি না মাঠান। কি করি। মসজিদের পাশেই থাকেন সাধুবাবা। তিনিও আমাদের দেবদেবীর মত পুজা পান। তা সাক্ষাৎ অবতারের সামিল। দাশু কর তারে মাথায় করে রাখে। মাঠান মাথার উপর কেউ না থাকলে যে অরাজক অবস্থা। সবাই এটা বোঝে। কেবল পোকামাকড়ে বোঝে না।

সাধুবাবার কাছে গিয়ে উদয় হলে কন, আস্থাভাজন বুঝিস না! আস্থাভাজন হল গে বিশ্বাসী। ভগমানও অবিশ্বাসীদের ক্ষমা করেন

না। বিশ্বাসী হলে পাপ তাপ থাকে না। সব কসুর ক্ষমা করে দেন ভগমান।

কত বড় কথা মাঠান। সব কসুর ক্ষমা—কথাটার অর্থ জানার পর মনে হয়েছে মাঠান আমার জীবন সার্থক।

মাঠান মানুষ ত দোষে গুণে। তা আমার দোষ থাকবে না সে কি করে হয়! ময়নারে চেনেন। আকালের বউ—বড় অনটনের সংসার। ফল পাকুড় পোকামাকড়ে খায়, পচে, চোখে তখন সয় না। আড়ালে ময়নারে ডেকে দিই। বলি, নিয়ে যা। শিগগির পালা। কর্তার পিসি দেখলে বাড়ি মাথায় করবে। হা মাঠান এটা কি পাপ! নষ্ট হবে পচবে তবু হাত ধরে দেবে না। আমি দিই। ওতে কি মাঠান নরকবাসের আশঙ্কা আছে? আপনি বলে যান। মনে বড় কূট কামড়। আমার এ-হেন আচরণে দেবী চামুণ্ডার কোপে পড়ে যাব না ত! বৃক্ষের তলায় গিয়ে আত্মঘাতী না হই আবার। বড় ডরে ধরেছে।

আচ্ছা মাঠান অন্নদাতা হলগে ভগমান—ঠিক না? ভগবানের বউ যদি আমারে দেখলেই কুচকি চুলকাতে থাকে—তা আমার ভগবান ত পূজা পেতে পেতে মুটিয়ে গেছে, অতি বেটে মানুষ, গোলাকৃতি, কচ্ছপের ধীর গতি, তা ভগবানের বউ যখন চুলকাতে চুলকাতে হাঁটুর উপর শাড়ি তুলে ফেলে আমার কি করণীয়। বলে কি না অসুরের মত দেখতে, বোধ বুদ্ধি কম। ভগবানের বউ হলগে দেবী। দেবীর কি ইচ্ছে বুঝতে পারছি। আমার কি করা উচিত কয়ে যান। বড় ফাঁপড়ে পড়ে গেছি।

ছোটবংশী এবার ডেরায় ফিরে ভিতরে ঢুকে গেল। দেবীর সঙ্গে দেখা হলে কি নালিশ দেবে তাও ঠিক হয়ে গেছে। এখন রাত পোহালে নিস্তার। পিচাশিতলার গাছগুলো দূরে ছায়া হয়ে ভাসছে। সেখানে রুদ্র ভৈরবী তিথিতে কেউ আত্মঘাতী হবে। সে কে?

হিসাবের গণ্ডগোলটাই বড় গণ্ডগোল মাঠান। কি হিসাবে কে আত্মঘাতী হয় কিছুই জানি না। আত্মঘাতী হবার আগে মাথাও ঠিক থাকে না। আমার মাথা পরিষ্কার। কোনো গণ্ডগোল খুঁজে পাচ্ছি না। আমার এখন একটাই মরণ, কে ধান খায়? মনুষ্যে খায়, না পোকামাকড়ে খায়। পোকামাকড়ে খেলে সয়। মনুষ্যে খেলে সয় না এ ভগবানের-কোন বিধান কয়ে যান দেবী। মাঠান এমন চমচমে জোছনায় আপনার ভ্রমণের অপেক্ষায় বইসে আছি।

ছোটবংশী ডেরায় বসে এবার একটা বিড়ি ধরাল। ঠাণ্ডাটা আরও

চেপে বসছে। এদিক ওদিক ডংকা বাজছে সে শুনতে পায় বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে। গাছ নাকি তুলে নিয়ে যায় আত্মঘাতীকে। সে আতঙ্কে আর পিচাশিতলার দিকে তাকাতেও পারছে না। মশা ভন ভন করছে। উলানি পোকা কামড়াচ্ছে। কত সহস্র কীটপতঙ্গ মাঠে। সব প্রাণীকুলের হিসাব তেনার হাতে। তা গণ্ডগোল হতেই পারে।

ছোটবংশী বিড়ি ফুঁকছিল আর ভাবছিল।

দিগন্তব্যাপ্ত এখন কুয়াশার জাল। রাত বাড়ছে বোঝা যায়। কুয়াশায় কখন সব অস্পষ্ট হতে শুরু করেছে! একে জোছনা তার সঙ্গে কুয়াশা—যেন রাবণ রাজার পুত্রের মত এখন মেঘের আড়াল থেকে দ্বাদশ বৃক্ষ অদৃশ্য এক শত্রুর সঙ্গে সমরে লিপ্ত হতে চাইছে। এমন কি টিনের খুঁটিও অস্পষ্ট।

হঠাৎ এত কুয়াশা কোথা থেকে ভেসে আসতে থাকল! কে জানে দ্বাদশ বৃক্ষের পিচাশিরা ধূম উদগীরণ করছে কি না! না দেবী চামুণ্ডা কুয়াশার রূপ ধারণ করে বিশ্বচরাচরকে ঢেকে দিচ্ছে! সে কিছুই বুঝছে না। সে কিছুটা ভ্যাবলু বনে বসে আছে। বিশ্বাসী মানুষ—জাগাল ছেড়ে পালাতে পারছে না।

নিশুতি রাতের মহিমাতে সে মাঝে মাঝে ভারি তাজ্জব বনে যায়। দূরে আলেয়া, এই আছে এই নেই। ভৌতিক ব্যাপার সে ভাবে সব তেনারই লীলা খেলা। বিলেন জায়গা। মানুষের আত্মারা এমন ফাঁকা জায়গায় নিরিবিলি ঘুরে বেড়াতে ভালবাসতেই পারে।

মাঝে মাঝে মনে হয় খড়ম পায়ে কেউ হেঁটে যাচ্ছে দূরে। কখনও মনে হয় একটা আকাশের তারা টুপ করে ঝরে পড়ল ধরায়। কার গর্ভধারণ হল কে জানে! সে পালা গানে শুনেছে, আত্মার বিনাশ নাই। খাঁচার মধ্যে পাখি, পাখি উড়ে যায়। উড়ে গিয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। তারপর কখন একসময় আকাশের তারা হয়ে ফুটে থাকে।

তারপর জমি সরেস হলেই তারা খসে পড়ে ধরায়। গর্ভবতী হয় জননী। তারা খসে পড়ার দৃশ্য দেখতে দেখতে কত রাত সে যে বুঁদ হয়ে যায়। একটা খসল, দুটো খসল, ও-দিক পানে কবরখানায় গাছপালা পার হয়ে একটা খসে পড়ল, ওই একটা তারা ছুটে যাচ্ছে সুলতানপুরের দিকে—তারপর তারা অদৃশ্য।

সকালে জাগাল থেকে ফিরে যাবার সময় কারো সঙ্গে দেখা হলেই বলবে, ধরায় আবার তেনারা ফিরে এয়েছেন। ছোটবংশীর আরও

মনে হয় তার পিতাঠাকুর তার জননীও আর আকাশের তারা হয়ে ঝুলে নেই। কারো গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েছেন তেনারা। তাদের বাল্যলীলা চলছে কি চলছে না তা অবশ্য সে ঠিক জানে না।

॥ আট ॥

বুঝে ওঠার আগেই কি ভাবে যে সব ঘটে গেল। সে কিছুটা নির্বোধের মতো তাকিয়ে আছে ঈশানীর দিকে। ঘাসের উপর শুয়ে আছে ঈশানী। যেন শত ডাকাডাকিতে তার বিন্দুমাত্র সাড়া পাওয়া যাবে না। চোখের পাতা থেকে ঠোঁটের রঙ সবটাইতো কৃত্রিম। ফ্যাশানের বিজ্ঞাপনগুলি এ জন্য দায়ী সে বোঝে। তবু কেন যে মনে হয় ঈশানীর শরীরী আকর্ষণ, তার লাস্য, তার ব্যক্তিত্বের মোহ সবই নিখাদ।

এটাই ঈশানীর ম্যাজিক। শরীরসর্বস্বতা কী তুলনাহীন সুন্দর। তার এই যে নগ্ন ছবি, শুয়ে আছে ঘাসের উপর হাঁটু ভাঁজ করে, পোশাক তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে, প্রায় ছুঁড়েই দিয়েছে সব শরীর থেকে, তার এত কাণ্ডজ্ঞানের অভাব এমনও মনে হয়েছে, সেও ঠিক ছিল না—হাত পা কাঁপছিল উত্তেজনায়—জড়িয়ে ধরে ঈশানী পাগলের মতো তাকে চুমো খেয়েছে, যেন গিলেই ফেলবে—এমন উদ্দামতা তার সহ্য হবার কথা নয়, পালাতেও পারছে না—শেষে তার আত্মসমর্পণ— ঈশানী তাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে যখন চাইছে খাক। যা খুশি করুক তাকে নিয়ে।

তার হুঁশও ফিরে এসেছে। কালো পাথরের পাষাণ বেদীটি যে দেবীর থান এও সে বুঝে ফেলল। পিচাশিতলার জঙ্গলে ঢুকে সে বুঝতেই পারেনি, ঈশানী কোথায় তাকে নিয়ে যাচ্ছে। দুপুরের রোদ গাছের মাথায়। কাক পক্ষীও ডাকছে না। প্রাচীর সংলগ্ন করবী গাছ থেকে হলুদ ফুল দুটো একটা উড়ে যাচ্ছে যেন হাওয়ায়। বড় নিরিবিলি নির্জন এই জঙ্গল মধ্যে যে কেউ ঢুকে পড়তে পারে, ঈশানীকে নগ্ন অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে—সে বোধও নেই ঈশানীর। সে আর কি করে!

ছুটে গেল, তুলে নিল পাজামা আর ব্রেসিয়ার। দ্রুত কাজগুলি সারতে না পারলে তারা ধরা পড়ে যাবে! ঈশানীর কি কোনো সম্ভ্রম বোধ নেই—ইজ্জতের ধার ধারে না! সে যে পাগলের মতো কাণ্ড ঘটিয়ে বসে আছে সেই বোধও বুঝি নেই। এক আশ্চর্য স্বর্গীয় সুখ তাকে ঘিরে আছে যেন।

ঈশানীর চোখ কেমন স্থির অথচ আশ্চর্য মায়া চোখে। তাকে শাসনও করা যায় না চোখে দেখলে। তারা এই বিবস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়ে যেতে পারে তাও খেয়াল নেই ঈশানীর।

সে ডাকল, ঈশানী প্লিজ, এ-ভাবে শুয়ে থাকে না! ওঠো।

পশমের ঢোলা পাজামা শিথিল দু পায়ে গলিয়ে দেবার সময় মনে হল ঈশানী, সারাজীবন এই ঘাসের উপর শুয়ে থাকতে চায়। নদী পাহাড় সমুদ্রকে এই শরীরে সে ধরে রাখতে চায়। নদীর ঢেউ, সমুদ্রের গর্জন, পাহাড়ের নিস্তব্ধতা তার শরীর এত দিন সুখ বহন করে এসেছে এই আত্মপ্রকাশের ক্ষমতাকে জাহির করার জন্য।

যেন কতদিনের এই স্বপ্ন। তার কাছে ঈশানী শুধু স্বপ্ন নয়, স্বপ্নপূরণও। ঈশানীর আপাত সারল্য এবং রোমান্টিক অসহায়তার সে শিকার। এত সব ভেবেও সে ঈশানীর উপর কেন যে রাগ করতে পারে না। ঈশানী যে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই চায় না। চোখে তার একই সঙ্গে সারল্য এবং অকপট প্রেম। সাহস এবং লাস্যেরও অভাব নেই।

ঈশানী তার জানালায় চুপি দিয়ে ডেকেছিল, ডাক্তার যাবে?

কোথায়!

চলই না।

ঈশানীর যে খুবই কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে সে জানে। এই দুপুরের রোদে ঈশানীর সঙ্গে বের হয়ে যাওয়া শোভনও নয়—কিন্তু ঈশানী যখন তখন চলে আসে কোনো না কোনো অজুহাতে। ঘর এত নিরিবিলি—অথচ ঈশানী ঘরের আড়াল থেকে তাকে বের করে নিতে চায়। বোধ হয় ঘাস ফুল পাখির জগতে ঈশানী তার স্বপ্নকে খুঁজে পায়, তার মানুষটিকেও।

মাঠ পার হয়ে টিলা পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে যাবার সময় সুধাময় না বলে পারেনি, সত্যি তোমার মাথায় পোকা আছে। তোমার বাড়ির লোকেরা খারাপ ভাবতে পারেন। গাঁয়ে আমাদের নিয়ে কথা ওড়াউড়ি হতে পারে।

সে কোন কথাই কানে তোলেনি।

সে চলে আসতে পারত, কিংবা বলতে পারত, না ঈশানী, আমার সময় হবে না। ঈশানীর দিকে তাকিয়ে তাও সে বলতে পারেনি। ঈশানীর চোখের মায়ায় আশ্চর্য যাদু আছে। তাকে অবহেলা করার ক্ষমতাই তার নেই। শোভন-অশোভন তখন কিছুই মনে থাকে না। সাইকেলে দুপুরের রোদে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে তার কোনো

দ্বিধা হয়নি। গাঁয়ের কাচ্চাবাচ্চারাও হয়েছে তেমনি—ঈশানীদি বলতে অজ্ঞান। আবার ধমক খেলে সরে গিয়ে ঈশানীকে যাবার পথও করে দেয়।

কী সুন্দর জায়গাটা না!

নিরিবিলি এবং শীতল। গাছের ছায়া স্থির হয়ে আছে। কত রকমের পাখির কলরব। জঙ্গলে নাম না জানা সব ফুল ফুটে আছে। হেমন্তের এই শেষাশেষি, মন্দির, মন্দিরপ্রাঙ্গণ, থান—অদূরে জলাশয়, এবং নিবিড় হয়ে থাকা দ্বাদশ বৃক্ষে কি হেতু আতঙ্ক ছড়িয়ে থাকে সে বুঝে উঠতে পারে না।

ঈশানী বলেছিল, এই থান, দেবী সবই মল্লারপুরের জমিদারেরা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। দ্যাখো কি সুন্দর ভাস্কর্য—বলে থান পার হয়ে জানালায় উঁকি দিয়েছিল ঈশানী। চামুণ্ডার বিশাল মুণ্ডমালার মধ্যে সে কি আবিষ্কার করেছিল কে জানে—বলল, দ্যাখো, নারী কী চায়। দেবী মুণ্ডমালা শোভিত। তার প্রেম যশ, কীর্তি এই মুণ্ডমালার অপযশে। এস।

হাত ধরে সে ছুটেছে। জলাশয়ের ভগ্ন সোপানে তাকে নিয়ে বসেছে। তারপর দ্বাদশ বৃক্ষের নিচে ঘুরেছে। দূর থেকে দ্বাদশ বৃক্ষের পরিধি এত বড় বোঝা যায় না। গাছের কাণ্ডগুলি বেশ উঁচুতে উঠে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে।

গাছের ডালপালাও ছড়িয়ে আছে চারপাশে। অনায়াসে লাফিয়ে ডালে ওঠা যায়। মাটি থেকে সামান্য ওপরে এই সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অতিকায় ডালে উঠে গেল ঈশানী। এক-একটা ডাল গাছের কাণ্ডের চেয়েও মোটা—কত দূরে ছড়িয়ে আছে।

তারের উপর দিয়ে সোজা হেঁটে যাবার মতো এক ডাল থেকে অনায়াসে অন্য ডালে উঠে গেল ঈশানী।

তাকে ডাকছিল, এস।

ঈশানী কি করছে। ভয়ডর নেই!

ডাল থেকে ডালে লাফিয়ে পড়ল। ঝুলে পড়ল ডাল ধরে। তারপর ভল্ট খাবার মতো আর একটা ডাল ধরে ফেলল।

এস ডাক্তার। উঠে এস না।

ডালের উপর দাঁড়িয়ে মজা করছে ঈশানী। এরোবিকস দেখাচ্ছে তাকে।

সে বলল, পড়ে মরবে।

এতে ঈশানী যেন আরও মজা পেয়ে গেল। বন্য হরিণীর মতো

চঞ্চল হয়ে উঠছে।

দ্বাদশ বৃক্ষকে নিয়ে কত গুজব। অথচ কত অনায়াসে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে ঈশানী। পাতার আড়ালে হারিয়ে গিয়ে কু করছে।

সে শহরে বড় হয়েছে। গাছে কি করে চড়তে হয় সে জানে না। তবে গাছের কিছু ডাল এত সোজা সরল যে, সহজেই লাফিয়ে ওঠা যায়। ডালগুলি এত মোটা যে সহজেই দাঁড়িয়েও থাকা যায়। সে একটা ডালে উঠে গিয়ে ঈশানীকে খুঁজল। নেই। শুধু গাছ পাতা আর ডালের সমারোহ—ঈশানীকে খুঁজে পাচ্ছিল না। গাছের ঘন ডালপাতার ঝুপড়িতে ঢুকে বসে আছে।

সে ডাকলে ঈশানী সাড়া দিচ্ছে না।

সে ডাকলে মাঝে মাঝে সর সর করে ডাল ঝাঁকিয়ে দিচ্ছে ঈশানী।

সে একসময় বিরক্ত হয়েও পড়েছিল। এই দুপুরে কি যে দরকার তাকে নিয়ে এমন লুকোচুরি খেলার। এতে কি আনন্দ ঈশানীর তাও সে বোঝে না। একটা গাছ থেকে আর একটা গাছে যাওয়াও সহজ। একসময় সুধাময় সত্যি ফাঁপড়ে পড়ে গেল। কোনো সাড়া নেই। ডালপাতাও ঝাঁকাচ্ছে না। দ্বাদশ বৃক্ষের কোন বৃক্ষের মাথায় ঈশানী লুকিয়ে আছে তাও বুঝতে পারছে না। সে ডাকছে, এই ঈশানী কি ছেলেমানুষী হচ্ছে। নেমে এস। নেমে আসবে কি না বল। ঠিক আছে চললাম।

সুধাময় গাছগুলি দ্রুত পার হয়ে যাবার সময়ই ঈশানী তার সামনে ডাল থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল।

সুধাময় ধমকও না দিয়ে পারেনি। কী হচ্ছে এসব!

গাছগুলি সত্যি অতিকায়। অসংখ্য ডালপালা নিয়ে নিজেদের মধ্যে জড়াজড়ি করে বড় হয়েছে। কালো কুচকুচে পাতাগুলি এত ঘন যে ফাঁকে ফোকরে কোনো আকাশও ভেসে ওঠে না। দিনের বেলাতেই অন্ধকার থাকে জায়গাটা। ঈশানী গুটি গুটি ভীরু বালিকার মতো তার কাছে হেঁটে এসেছে। বলেছে, গাছগুলির কি দোষ বল!

গাছের আবার দোষ কি!

গাছগুলোর নিচে কেউ আসে না জানো?

কি হয় এলে।

বাতাস লাগতে পারে। কুবাতাস। আমরা তো হাঁটছি। তোমার কিছু মনে হচ্ছে! ভয় পাচ্ছ না তো। গাছ কখনও মানুষের অনিষ্ট

করতে পারে ? কী সুন্দর। কত শান্ত না !

সুধাময় বলেছে, দারুণ জায়গাটা। আমার তো খুব ভাল লাগছে জায়গাটা। কিন্তু তুমি যা করছ না !

তোমার ভাল লাগবে বলেই তো নিয়ে এলাম। আরও কত জায়গা আছে, তোমাকে নিয়ে ঘুরব। ক্রোশ দশেক গেলে কপালিতলা। গেলে মন জুড়িয়ে যাবে। পাশে ময়ূরাক্ষির ক্যানেল, তারপর শালবন। তোমাকে নিয়ে একদিন শালবনে ঘুরে বেড়াব। কি যাবে তো।

ঈশানী এভাবে অজস্র কথা বলে যাচ্ছে। গাছের ডাল সরিয়ে রাস্তা করে দিচ্ছে। ঘাসপাতা মাড়িয়ে তারা হেঁটে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে ঈশানীর কি যে হয়—সে দেখেছে, তার ভাল লাগলেই, ঝুম দেওয়ানা ঝুম, শরীরে তার তখন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি। গাছগুলোর ছায়ায়, কিংবা জঙ্গলের গভীরে কোনো ঘাসের অবকাশ পেলে তার শরীর দুলে উঠছে। ঠিক আগের মতো কোমর বাঁকিয়ে যখনই গায় আশ্চর্য এক যৌন আবেদন শরীরে খেলা করতে থাকে।

ঈশানী এক পা হাঁটে, দু' পা যায় তারপর কেমন কোমর দুলিয়ে দেয়—ডোন্ট ক্রাই ফর মি।

এভাবেই ঈশানী জঙ্গলে ঢুকে তার কাছে অন্তরঙ্গ অভিলাষে মত্ত হতে হতে কখন যে পাগল প্রায় তাকে কাবু করে ফেলল কিছুই মনে করতে পারছে না। কখনও কিছুটা পোশাক খুলে আলগা হয়ে গেল, কখনও সবটা খুলে আলগা হয়ে গেল—কখনও দাঁড়িয়ে রক্তের সমুদ্রে সাঁতার দেবার মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার শরীরে।

জঙ্গলের গভীরে ঢুকে বুঝতে পেরেছিল সুধাময়—ঈশানী ঠিকই জানে, তার এই খোলামেলা গান কত দূর থেকে শোনা যেতে পারে। কখনও মনে হয়েছে মঞ্চের মাঝখানে টাঙিয়ে দিয়েছে, কল্পিত এক পর্দা। যেন সমুদ্রে সে স্নান করতে নামছে। পোশাক খোলার কল্পিত অঙ্গভঙ্গি তার দারুণ সুন্দর। একটা একটা করে খুলছে। একটু একটু করে জলে নামছে। দু-হাতে ঢেউ ভাঙছে তারপর ফের গান গাইতে গাইতে পোশাক পরে রক্তমাংসের ঈশানী হাজির হচ্ছে তার সামনে। তার কিছু করার ছিল না। সে ঈশানীর ঘোরে পড়ে গেছিল।

ঈশানী তাকে এভাবে অভিভূত করতে করতে...কখনও যেন নদীর পাড়ে হাঁটছিল, কখনও সমুদ্রে উড়িয়ে নিয়ে গেছে, কিংবা ফুলের সৌন্দর্য, সৌরভে বুঝিয়েছে। এমন একজন অন্তরঙ্গ শ্রোতার অন্বেষণেই যেন সে ছিল। গাছপালা পাখির জগৎ ছাড়িয়ে, এই মন্দির

ঈশানী !

সুধাময় চিৎকার করে উঠল। সে যে কত নিরুপায়, সে তার বিবেকের কামড়ে অস্থিরও হয়ে পড়ছে। সে চতুর হতে পারত। পালাতে পারত। সে কি ঈশানীর কাছ থেকে পালাতে চায়। পালাতে চাইলে ভালবাসার দাম থাকে কোথায়। একজন তস্করের মতো সে ঈশানীর সব কিছু আজ লুণ্ঠন করেছে। তার বোধ বুদ্ধি রুচিবোধ জলাঞ্জলি দিয়েছে। এই প্রবল বেদনা তাকে ক্রমেই অস্থির করে তুলছিল।

বালিকার আবদারের মতো কেবল ঈশানী বলছিল, আমি তোমার সঙ্গে যাব ডাক্তার। আমাকে তুমি ফেলে যেও না। আমার তো ইচ্ছে হয়।

তোমার এই ইচ্ছেটা ছাড়ো ঈশানী। আমাকে তুমি আর ডুবিও না।

বারে তোমাকে আমি ডুবিয়েছি !

হ্যাঁ হ্যাঁ ঈশানী আরও বড় সর্বনাশ আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারে !

তোমার সর্বনাশ ! কে করবে ! কার সাহস !

তুমি বোঝো না কি করেছি আমরা ! আবার বলছ কি হয়েছে ডাক্তার। তুমি কি সত্যি নির্বোধ। দিন দুপুরে কেন এখানে নিয়ে এলে— ? কি দরকার ছিল। তোমার এত বড় সর্বনাশ কেন করলে ! আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। পরিণতির কথা ভেবে সুধাময় মুহূর্তে যেন কঠিন হয়ে গেল।

ডাক্তার শোনো। প্লিজ। তুমি এত ভেঙে পড়ছ কেন ?

জানতে পারলে তোমার বাবা কি আমাকে ক্ষমা করবেন।

ডাক্তার এত স্বার্থপর হয়ো না। প্লিজ। আমার কতকালের এই ইচ্ছেকে আজ তুমি সম্মান জানালে, তুমি আমাকে ভালবাসো না ডাক্তার ! তুমি আমাকে ভালবাসো না ? প্লিজ বল।

বাসি।

সত্যি বলছ !

আমার গা ছুঁয়ে বল।

সুধাময়ের চোখ কেন যে আপ্লুত হয়ে উঠল অশ্রুতে। ঈশানীর কাঁধে হাত রাখল—কিন্তু কিছুই প্রকাশ করতে পারল না। ঈশানী বুঝতে পারছে না, গর্ত থেকে সাপটা বোধ হয় এতক্ষণে সত্যি বের হয়ে পড়েছে। সাপটা ফণা তুলল বলে।

তুমি শুধু নিজের কথা ভাবছ ডাক্তার। আমার কথা ভাবছ না।

ঈশানী আমি গরীব বাবার ছেলে। আমার এই আস্পর্ধা তোমার বাবা সহ্য করতে নাও পারেন। তিনি আমার চরম ক্ষতি করতে পারেন।

করলে কি আসে যায়! ভালবাসা কি তাতে খাটো হয়ে যায়, বল ডাক্তার।

সুধাময় বলল, ঠিক আছে। এস।

ঈশানী সত্যি বালিকার মতো তাকে অনুসরণ করছে। ওর খোঁপায় ডালপাতা লেগে আছে। জামাতেও। সে তাকে সামনে দাঁড় করিয়ে পোশাক থেকে শুকনো ডালপাতা ঝেড়ে দিল। ওর পশমের পাজামা থেকে চোরকাঁটা বেছে দিল! চুল এলোমেলো হয়ে আছে। সুধাময় পকেট থেকে চিরুণী বের করে চুল আঁচড়ে দিল।

ঈশানী দাঁড়িয়ে আছে শিশুর মতো।

ঈশানী ছোট্ট একটা জামার পুঁটুলি দু-হাতে জড়িয়ে রেখেছে বুকে। ওর জ্যাকেট, মাথার স্কার্ফে জড়ানো সে জানে।

সুধাময় তার দিকে তাকিয়েই আছে। যেন এই নারী সুধাময়কে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে চেনে না। বড় বাধ্যের হয়ে গেছে। নদী পার হতে বললে, নদী পার হয়ে যাবে। মরু পারাবার কথাটাও মনে হল তার। এই মরু পারাবারই তাকে সাহস যোগাল। দুস্তর মরুপার হতে হয় ভালবাসলে।

সে ঈশানীকে সতর্ক করে দেবার জন্য বলল, অত ঘন ঘন আমার কাছে ছুটে এস না। আর তো আড়াইটে বছর। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

আমি যে ডাক্তার তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না। চেষ্টা করি পারি না! কেমন পাগল পাগল লাগে। আমার যে বার বার ইচ্ছে হয় তোমার কাছে ছুটে যাই। গেলে দোষের বল! আমি তো নিজের মানুষের কাছে যাচ্ছি। ভয় কিসের।

তবু ভয় আছে। আমরা বোকামি করে ফেলেছি, আর না করাই ভাল। কেউ যদি দেখে ফেলে!

দেখুক না।

না ঈশানী, ভালবাসা বড় গোপন হয়ে থাকতে চায়। তাকে সবার সামনে জাহির করা যায় না। তোমার বাবা কেন, কোনো বাবা মা-ই ভালবাসার দাবীকে স্বীকার করতে চায় না। জানতে পারলে তিনি আমাদের ক্ষতিও করতে পারেন।

এই সময় সুধাময় দু-জনেরই ক্ষতি হতে পারে ভাবল। সে বলল, সময়টা ভাল না। থানের জাগ্রত মহিমা আছে শুনেছি। সেটা কি আমি ঠিক জানিও না। সারা পৌষমাস মেলা বসবে। কত দূর দূর থেকে তীর্থযাত্রী আসবে। থানের চাতালে হত্যে দেবে। শনি মঙ্গলবারে রাশি রাশি পাঁঠাবলি। কত কি, এবং তোমাদের সেই রুদ্র ভৈরবী তিথিতে একজন আত্মঘাতীও হবে। তিথি নক্ষত্র দেখে কেউ কখনও আত্মঘাতী হয় আমি কেন যে বিশ্বাস করতে পারি না। বুঝি ঠাকুর পঞ্চতীর্থ ইচ্ছে করলে যে কোনো মানুষের মধ্যে ঘোর সৃষ্টি করতে পারেন এত রাতে না হলে তুমি পিচাশিতলায় যাও!

ঘোর না ছাই।

তা হলে গেলে কেন!

আমার যে ইচ্ছে হল।

তোমার বাবা জানতেন?

বাবার কথায় ঈশানী ভ্রূ কুঁচকে দেখল সুধাময়কে। যেন সেটা আবার কি?

ঈশানী তুমি বোঝো, তোমার বাবা খুবই ক্ষমতাবান মানুষ। লোকে আড়ালে আবডালে নানা কথা বলে। সত্য মিথ্যা আমি কিছু জানি না। তবে তিন চার মাসে বুঝেছি, তিনি ইচ্ছে করলে সব পারেন। একদিকে তিনি, আর একদিকে এই ঠাকুর পঞ্চতীর্থ। ন্যায় অন্যায় বোধই মানুষের নেই। শুধু শিবের মাথায় বিল্বপত্রটি চাপালেই সাতখুন মাপ।

ঈশানী এতটা সিরিয়াস কথাবার্তা শুনতে অভ্যস্ত নয় সে বোঝে। তারপর কি ভেবে কিছুটা হাল্কা গলায় বলল, যাকগে, ঠিক করেছিলাম—তোমাদের রুদ্র ভৈরবী তিথিতে এখানে থাকব না। বাড়ি চলে যাব। আজ যা হল, তাতে বাড়িও চলে যেতে পারি না।

ঈশানী কি যেন টের পাচ্ছে। বলল, আমিও চলে যেতে পারতাম। তবে যাব না। তোমাকে ফেলে যাই কি করে! চোরের মতো পালাতেও খারাপ লাগছে। নিজের কথা আজকাল আর কেন যে ভাবতেই পারি না, কী যে হয়েছে!

কার কথা ভাবো।

ঈশানী চোখ তুলে তাকে দেখল। কার কথা ভাবে সে কিছুই প্রকাশ করল না।

তারা ডাল পালা সরিয়ে কখনও হাঁটছে, কখনও দাঁড়াচ্ছে, কখনও পেছনে তাকাচ্ছে, কখনও সামনে।

জঙ্গলের ভিতর থেকেই রাস্তাটা দেখা যায়। তবে তারা ওদিকে যাবে না। সাইকেল দুটো আছে ভাঙা ঘাটলার কাছে। এই পিচাশিতলায় একটি ভাঙা সোপানে হেলান দিয়ে রেখেছে সাইকেল দুটো। দু-একটা পাতা ঝরে পড়ছিল। হাওয়ায় গাছের ডালপালা নড়ছে। চেম্বার থেকে ফেরার পথে, এই পিচাশিতলা তাকে যে ভয়ঙ্কর আতঙ্কে ফেলে দিয়েছিল তাও মনে হল। হাসিও পেল। নিরীহ সরল এই বৃক্ষের উপর ধর্মের অপবাদ ছড়িয়ে জায়গাটাকে কি না অস্বস্তিকর ভুতুড়ে করে তোলা হয়েছে যুগ যুগ ধরে। নিরীহ শান্ত এই পরিবেশ কখনও রাতে এত অশান্ত হয়ে উঠতে পারে বিশ্বাস করতেও তার কষ্ট হচ্ছিল। মানুষই মানুষের ক্ষতি করে। দেবদেবী, ভূত প্রেত অতি তুচ্ছ মানুষের কাছে। মানুষের হাত না থাকলে জঙ্গল অশান্ত হয়ে উঠবে কেন। গাছ কখনও উড়ে যেতে পারে? তার ডালপালা? অথচ এলাকার মানুষের যুগ যুগের বিশ্বাস—পারে। ঠাকুর দেবতাকে তুচ্ছ করো না ডাক্তার, পরে পস্তাবে।

গুরুপদ দেখল, ডাক্তারবাবু বাগানের পথ ধরে উঠে আসছেন। ঈশানীদি ডাক্তারবাবুকে খুবই জ্বালাচ্ছে। কিছু বলতেও পারছে না। একবার ভেবেছিল, বলবে, যাবেন না বাবু। ডাকলেই যাবেন না। কি থেকে কি হয়ে যাবে বলা যায় না। জাঁহাবাজ মেয়ে। লাটুবাবু নিজেই নাকি মেয়ের জন্য আতঙ্কে পড়ে গেছেন। কিছু বলতেও পারেন না। কেন পারেন না, তার নাকি অনেক কারণ।

লাটুবাবু নিজে এত খতরনাক আদমি, অথচ নিজের মেয়ের কাছেই টাইট। শুধু এটুকু জানে ঈশানীদির কাছে বাবুর গোপন কথাবার্তার অনেক টেপ আছে। মেয়ে যে এতটা বিগড়াবে তিনি ভাবতেই পারেননি। একবার শাসাতে গেলে ঈশানিদি একটা টেপ ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, কটা বটা জটার সঙ্গে তুমি কথা বলেছিলে। টেপটা শোনো। কথাগুলো নিশ্চয়ই গৌরবের না। শুনলে বুঝতে পারবে।

বলে কি ঈশানী!

লাটুবাবু টেপ শুনে থ।

এটা আমার কাছে থাক।

থাক না। রেখে দাও। তোমাকে দেবার জন্যই কপি করে রেখেছি। আরও চাও তো দিতে পারি। কি হবে বাকিগুলি শুনে। তোমার মন খারাপ হবে।

লাটুবাবু সেই থেকে মেয়েকে আর বিন্দুমাত্র ঘাঁটান না। মাঝে মাঝে, এটা করা উচিত না তোমার ঈশানী। তুমি বড় হয়েছ, বুঝতে

শেখ। টেপগুলো হাতড়াবার নানা ফন্দি ফিকিরও কাজে দেয়নি। নিজের এই কেচ্ছার কথা জানাজানি হলে কেলেঙ্কারি। মেয়ের কাছে বাপের এই গোপন তথ্য এতদিন বহাল তবিয়তেই আছে। ঈশানী কোনো বাড়াবাড়ি করেনি। মীরাদি ঈশানীকে যে নানাভাবে সাহায্য করেছে তাও বোঝা যায়। টেপের মধ্যে নানা ষড়যন্ত্র, খুন, দাঙ্গার রহস্যও ঈশানীদি বন্দী করে রেখেছে। লাটুবাবু যা লোক, নিজের মেয়েকেও না শেষ পর্যন্ত সরিয়ে দেন। তবে সম্ভব না। কারণ টেপগুলির হদিস না করতে পারলে শুধু শুধু মেয়েকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। তারপর কার হাতে পড়বে সে কে, বিপক্ষ পার্টির হাতে পড়লে তো, সোজা গলায় দড়ি।

লেখাপড়ায় এত ভাল ছিল ঈশানীদি, যে পণ্ডিতমশাই তাকে এখনও সূর্যতনয়া বলে। অথচ সেই ঈশানীদি কি হয়ে গেল! বাপের কুকীর্তির টেপ শুনতে শুনতে মাথাও খারাপ হয়ে যেতে পারে। কেমন যেন হয়ে গেছে। বোকা বোকা কথা বললে, তারও হাসি পায়। অবশ্য ঈশানীদি ঘরে এলে, সে ভিতরে থাকতে পারে না।

এই যে গুরুপদ, বাবুর জন্য এক প্যাকেট সিগারেট্ নিয়ে এস। এই যে গুরুপদ, যাও বাবুর জন্য পাউরুটি আনবে। সকালে কি ছাইপাঁশ জলখাবার দাও বুঝি না।

ডাক্তারবাবু মানুষটি এত ভাল, এত নিরীহ যে মনে হয়, ঈশানীদিও তা টের পেয়ে গেছে। না হলে ঈশানীদি তো কাউকে পাত্তা দেয় না। গাঁয়ের সমবয়সীদের তুই তোকারি করে। ছোটদের পকেট থেকে লজেন্স বের করে দেয়। ঈশানীদি বের হলে হল্লা করে ছোটরাও বের হয়ে পড়ে। গোল হয়ে ঘিরে ফেলে, ঈশানীদি আমাদের বাড়ি চল। ঈশানীদি আমাকে আর একটা লজেন্স দাও। গাঁয়ের কোনো বাড়ির সামনে ভিড় দেখলেই সবাই বুঝতে পারে ঈশানী ছুটিতে বাড়ি এসেছে। মোটরবাইকে যখন সাঁ করে বের হয়ে যায়, কে বলবে ঈশানীদি কলেজ পড়ুয়া মেয়ে—যেন ঈশানীদি নিজেই মাস্তান। নানা কিসিমের পোশাক পরে বাইকে উড়ে যেতে ভালবাসে। সেই ঈশানীদি ডাক্তারবাবুকে নেশায় ফেলে দিল—ঈশানীদি তো জানে, বাপ কোনো সুযোগ খুঁজছে—যদি কিছু একটা হয়ে যায়— এমনই সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে, সে বাথরুমে স্নানের জল রেখে দিল। ছেলেমানুষ, হয়তো এসে বলবে, ভাত দাও গুরুপদ। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

স্নান করবেন না।

না। ভাল লাগছে না। যা ঠাণ্ডা, স্নান না করলেও চলবে।

শীতে বড় কাবু ডাক্তারটি। তবে রোদে রোদে ঘুরে স্নান না করে থাকতে পারবে না। সকালে প্রায় দিনই বলবে, যা ঠাণ্ডা গুরুপদ, আজ না হয় স্নান নাই করলাম।

গরম জল করে দিচ্ছি। স্নান না করলে ঠাণ্ডার দিনে শরীর থেকে শীত যায় না।

খুব বাজে কথা। তবে তুমি যখন বলছ, স্নানটা করেই ফেলি তোমার অনারে।

সুধাময়কে বাড়ির রাস্তায় উঠে আসতে দেখলেই গুরুপদর ছুটে যাবার অভ্যাস। সাইকেলটা সে নিজেই তুলে আনে। আসলে কাজের চাপ কিছুই নেই। এতগুলি টাকা বাবু হাতে ধরে দেন যে সে কাজ করে পুষিয়ে দিতে পারছে না এমন ভাবে।

ঘরে ঢুকেই বলল, ভাত ঠিক ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আর বল না, ঈশানী সত্যি বোকা আছে।

গুরুপদ চুপ করে আছে। এত বেলায় ফিরে আসায় গুরুপদ রাগ করতেই পারে। সেও তার জন্য না খেয়ে আছে। সুধাময় কি বুঝে কিছুটা অপরাধের গলায় বলল, তুমি খেয়ে নিলেই পারতে। শুধু শুধু আমার জন্য বসে থাকলে কেন?

বসে থাকি নিজের গরজে। অসুখ বিসুখ হলে ছুতো নাতায় এখান থেকে ভেগে যেতে পারবেন। তখন আমার কি হবে! কেউ এখানে থাকতে চায় না। কোনো অসুবিধা না হয় তাই এত করি। না হলে আমার বয়ে গেছে করতে।

সুধাময় বুঝল এত বেলায় ফিরে আসায় খুবই ক্ষেপে গেছে গুরুপদ। সে তাড়াতাড়ি বাধ্য ছেলের মতো স্নান করল। পাজামা পাঞ্জাবি গলিয়ে একটা পাতলা শাল গায়ে টেবিলে এসে বসল। স্টোভ জ্বেলে গুরুপদ ঠাণ্ডা ভাত ডাল তরকারি, মাছের ঝোল সব গরম করে দিয়েছে। খাওয়ার চেয়ে শুয়ে পড়ায় বেশি আরাম। কোনোরকমে হাতমুখ ধুয়ে লেপ টেনে মুখ ঢেকে দিতে দিতে বলল, আমাকে ডেকো না। চেম্বার বন্ধ। আজ তো তোমাদের রুদ্র ভৈরবী তিথি শুরু। সেন্টার বন্ধ। দোকানপাট বন্ধ। যে যার ঘরে—বেশ ভাল ব্যবস্থা।

মাত্র ঘুমটা লেগে এসেছে। আসলে পিচাশিতলায় ঈশানীর নগ্ন সৌন্দর্য তাকে এখনও কাবু করে রেখেছে। ঘুমের ঘোরেও যেন ঈশানীকে সে দেখতে পাচ্ছিল—আশ্চর্য এক নারী তার সঙ্গে জড়িয়ে

গেল। সেই ঘোর থেকেই যেন বলছে, গুরুপদ আমার আর ভেগে যাবার ক্ষমতা নেই। আটকে গেছি। তোমাদের ঈশানীদি এত সুন্দর। পরীর মতো সে আমাকে কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে গেল গুরুপদ !

গুরুপদ বারান্দায় বসে সুতলি পাকাচ্ছিল। বাবু ঘুমের মধ্যে বলছে, না জেগে জেগে কথা বলছে, সে ঘরের ভিতর ঢুকে বুঝল বাবু ঘুমের মধ্যেই কথা বলছে।

গুরুপদ বলল, ও বাবু পাশ ফিরে শোন। কি আবোল তাবোল বকছেন।

আর তখনই ছোটবংশীকে দেখা গেল নিচে। আরও নিচে ঈশানীদি।

আবার !

গুরুপদ এটা নামাও।

কি আছে !

ঈশানীদি জানে।

ঈশানী ছুটতে ছুটতে উঠে আসছে। সাইকেল নিজেই তুলে রাখল চাতালের পাশে। গুরুপদ রাগে ফুঁসছে। এক দণ্ড বিশ্রাম দেয় না। কি আবার মাথামুণ্ডু নিয়ে হাজির। বেশি রাগারাগিও করতে পারে না, আবার গরজ না দেখালেও ঈশানীদি ক্ষেপে যেতে পারে।

সে তাকাল, ও বাবু উঠুন।

তোমাকে ডাকতে হবে না। ঈশানী ছুটে ঘরে ঢুকে গেল।

সুধাময় চোখ মেলে তাকাল। ঈশানীর চোখ বড় কাতর দেখাচ্ছে।

কি ব্যাপার ! সুধাময় তড়াক করে উঠে বসল।

ঈশানী কারুকার্য করা একটা চটের থলে বিছানায় ধপাস করে ফেলে সিলোফিন কাগজে মোড়া কি সব বের করে বলছে, গুরুপদ এগুলি তুলে রাখ। জাম, জেলি, বিস্কুট, পাঁউরুটি, চিড়ে, বাদাম—কাজু বাদাম দু প্যাকেট, চিজ দু প্যাকেট সব এক এক করে বের করছে, আর সুধাময়কে আড়চোখে দেখছে।

সুধাময় ব্যাগের ওপাশে শুয়েছিল কাত হয়ে। ভিতরে কি আছে আর, সে দেখতে পাচ্ছে না বলে, বুঝতেও পারছে না।

আর কিছু নেই !

আছে।

এক ঠোঙা আঙুর বের করতেই সুধাময় বলল, থাক থাক ভিতরেই

রেখে দাও। এত খেলে অসুখ করবে।

ঈশানী সুধাময়ের কথা গ্রাহ্য করল না। গুরুপদকে ডেকে বলল, বংশীদাকে চলে যেতে বল। পরে এসে থলেটা নিয়ে যাবে। আর তুমি শোনো, বাবুকে সকালে কি খেতে দাও।

শুধু রুটি।

গাঁইয়া আর কাকে বলে! শোনো, সকালে চার পিস পাউরুটি টোস্ট করে দেবে। একটা ডিমের পোচ। আর কি দেওয়া যায়, হ্যাঁ কটা আঙুর। একটা সন্দেশ। সকালের খাবার। রুটিতে চিজ মাখিয়ে দেবে। মন দিয়ে শুনে রাখো। কী রান্না কর দুপুরে?

ভাত ডাল মাছ। মাছ ডাল ভাত।

না চলবে না। সকালে যাবে। আমি যা বলব তাই হবে। এগুলো তুলে রাখো। হাঁ করে কী দেখছ, চটপট।

কোথায় রাখব দিদিমনি। বাবুর যে হাড়ি ডেকচিও নেই। পরিবার হাড়ি ডেকচি বের করে না দিলে ভাতও বাবুর ভাগ্যে জুটত না।

এভাবে হয়?

সুধাময় বলল, আমার চলে যায়।

বংশীদা চলে গেছে!

ডাকব।

বংশী এলে ঈশানী বলল, না, থলেটা এখানেই থাকবে। গুরুপদ বিকেলে চিড়ে ভেজে দিতে পার বাদাম দিয়ে। নারকেল কোরা দিতে পার। আচ্ছা ঠিক আছে তোময়া যাও।

গুরুপদ বের হয়ে গেলে, তলা থেকে সিলোফিনের পেপারে মোড়া কিছু একটা ভারি জিনিস টেনে বের করতেই সুধাময় কেমন তটস্থ হয়ে উঠল।

আরে এ দিয়ে আমি কি করব!

ঈশানী ট্রিগারে হাত রেখে বলল, চুপ, একদম কোনো কথা না। খুলি উড়িয়ে দেব। তারপর হেসে ফেলল। তারপর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর কেমন মনমরা হয়ে বলল, শান্তি পাচ্ছিলাম না। এটা রেখে দাও। কাজে লাগতে পারে।

এটা পেলে কোথায়।

কোথায় পাব বোঝো না। আমাদের নেতাদের এটা না হলেই চলে না। দু-চার গণ্ডা চাও তো দিতে পারি। তুমি রাখো। আর কিছু না হোক তোমার কাছে এটা আছে ভাবলেও আমি সাহস পাব।

এ-সবের আমি কিছু বুঝি না ঈশানী।

বুঝিয়ে দেব। সবই তো বুঝিয়ে দিচ্ছি। নিজে থেকে কবে বুঝলে বল। সুধাময় এ ঈশানীকে যেন চেনে না। শান্ত ধীর স্থির। সে পরে এসেছে সুতির একটা শাড়ি। হালকা প্রসাধন মুখে। চুলে দুটো সাধারণ ক্লিপ। গায়ে একটা উলেন ফুলহাতা ব্লাউজ। নরম সাদা ফুল তোলা শাল দিয়ে শরীর ঢাকা। লজ্জা মেয়েদের কত বড় ভূষণ ঈশানীর বসে থাকা না দেখলে বোঝা যেত না। স্নিগ্ধ অপরূপ এক লাবণ্য বিরাজ করছে ঈশানীর চোখে মুখে। অথচ বড় ম্রিয়মাণ। টোকা দিলে চোখ এক্ষুনি বুঝি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠবে।

ঈশানী বুকের আঁচল সামলে উঠে দাঁড়াল। এলোমেলো চুল মাথায় তার ওড়াউড়ি করছে। বাঁ হাতে চুল পেছনে সরিয়ে বলল, আমি যাচ্ছি। হাতে একদণ্ড সময় নেই। কি যে করি!

ঈশানীর এমন ব্যাজার মুখ সে কখনও দেখেনি। দৌড়ে বের হয়ে গেল। আঁচল চেপে ধরল মুখে। ঈশানী ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কি হল!

কিছু না। হাত ছাড়িয়ে সাইকেলে পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুধাময় বলল, পাগল।

গুরুপদ বলল, আমার কিছু ভাল লাগছে না বাবু। ঈশানীদিকে আমরা কখনও কাঁদতে দেখিনি। কিছু একটা হয়েছে। আপনি বাবু গাঁয়ের কিছু জানেন না, বোঝেন না। বড় অরাজক অবস্থা। বলব না ভাবছিলাম, কিন্তু নুন খাই, না বললেও পাপ। ঈশানীদির মেলা ঝামেলা। ওর সঙ্গে মিশবেন না বাবু। কার ঘাড়ে কটা মাথা লাটুবাবু রোজ গুনে দেখেন। ওর মেলা লোক। মাথার উপর পার্টি তো আছেই।

গুরুপদ তারপর উঠে গেল। ঘরের সামনে কিছুটা মাটি তুলে জল ঢেলে দিল। গর্তটার পাড়ে কাদা করা বেদিতে একটা শ্যাওড়ার ডাল, কিছু কুশ গাছ, একটা মটকিলার ডাল, বেতপাতা গুঁজে দিল। পাঁচখানা কড়ি রাখল। একখণ্ড লোহা জোগাড় করতে গিয়ে বেলা কাবার করে ফিরে এল। লোহার শিকটাও পুঁতে দিল কাদায়। রুদ্রভৈরবীর তুষ্টি বিধানে বাড়ি বাড়ি যা হচ্ছে, গুরুপদ বাবুর জন্য সে-সবই করছে। রাতে আর বের না হতে হয়, সে দু-বালতি জলও এনে রেখে দিল। সূর্য অস্ত যেতেই পিচাশিতলার দিকে মুখ করে বিড় বিড় করে কি মন্ত্র পড়ল। হাত জোড় করে হাঁটু গেড়ে মাটিতে মাথা ঠুকল কবার। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা জানালা বন্ধ করে বলল, কার

কপালে কি লিখে রেখেছেন মা চামুণ্ডা...মা মাগো !

উত্তুরে হাওয়ায় রাত নামতেই শীত বড় জাঁকিয়ে বসেছে। সুধাময় লেপে শরীর ঢেকে সর্ট প্র্যাকটিস অফ সার্জারি বইটা টেনে নিল। পাতা ওল্টাল। বাইরে কিছু নিশাচর পাখির ওড়াউড়ি, ঝোপে জঙ্গলে এই ভয়ঙ্কর রাত হয়তো ক্রমেই বিভীষিকাময় হয়ে উঠছে। জনপ্রাণীহীন এক ব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরের অস্পষ্ট আভাষ, দরজা জানালা বন্ধ এবং গুরুপদ রান্নাঘর থেকে মুখ বার করে বড় চিন্তাকুল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

সে বলল, রাতটির বড়ই হ্যাপা দেখছি। কেউ বাইরে বের হবে না গুরুপদ !

একজন বের হবে।

সে কে ?

সে কে বলতে পারব না। ভৈরবী কুহকে ফেলে তাকে পিচাশিতলায় নিয়ে যাবেই।

দরজা জানালা খুলে রাখলে ঘরে ঠাণ্ডা ঢুকছে। জানালা খুলে বাইরে এই ঘোর অমাবস্যা তিথিতে প্রকৃতির কি বাহার খুলেছে দেখার প্রবল বাসনা সুধাময়ের। কিন্তু গুরুপদ আছে বলে পারছে না। আজীবনের সংস্কারে সে আঘাত করতেও পারে না।

তখনই গুরুপদ বলল, রাতে কী খাবেন ?

কী খাওয়া যায় বলত ! কাল থেকে তো আর নিজের মর্জিমতো কিছু খাওয়াও যাবে না। তুমিই বল না কী খাওয়া যায় ?

কী আর খাবেন। ডিমের ঝোল ভাত করি।

ডিমের ঝোল ভাত, করো। তারপরই কি ভেবে যেন বলল, খিচুড়ি হলে বেশ জমত।

গুরুপদ রান্নাঘরে। তার কেন যে ইচ্ছে হল এই ফাঁকে দরজা খুলে পুকুরের পাড়ের দিকটায় কিংবা বাঁশের জঙ্গলে ঢুকে অন্ধকারের রূপ দেখে।

দরজা খুলতেই গুরুপদ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল।

এটা কি করছেন বাবু ! আপনার কি মাথা খারাপ আছে। রাস্তায় কেন, ঘরের বাইরে কেউ বের হবে না। এত দুঃসাহস হয় কি করে বাবু।

প্রায় তাকে ঠেলে ঠুলে সরিয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, বড়ই কু-বাতাস। ঝড়ের গতি। পলকে দেখতে পাবেন গাছে ঝুলে আছেন। ঠাকুরকে তুচ্ছ করার মতি হয় কি করে বুঝি না ! তাঁর কথা

বেদবাক্যি জানেন !

সে হাসল। তবু আজ এই রাতে কেউ আত্মঘাতী হবে—ঈশানী এলে, পালিয়ে বের হয়ে যাওয়া যেত। ঈশানী সহজেই রাতে ঘোরাফেরা করতে পারে। গ্রিলের পাশে কাঁঠালের ডালটি তার অবলম্বন। সে তাকে তা দেখিয়েছে। ফলস গ্রিলের কড়াতে তালা ঝোলে। চাবি দেয়ালে। সে তালা খুলে গভীর রাতে নিশাচরী হতে তার বাধে না। ঈশানী তেমন কিছু কি টের পেয়ে বিকেলে আজ এতটা অস্থির হয়ে পড়েছিল। বড় রহস্য ঠেকছে সব কিছু। ঈশানী কি সে-জন্য জিনিসটি তার কাছে রেখে গেছে। কিংবা ঈশানী কি গভীর রাতে চলে আসবে ! জিনিসটি দিয়ে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে গেল, আসছি। এক সঙ্গে বের হব। তিথি নক্ষত্র দেখে কেউ কখনও আত্মঘাতী হয় না। কোনও পরিকল্পিত খুন ছাড়া সে এটা ভাবতেও পারছে না। তান্ত্রিক পঞ্চতীর্থ তার উপর ক্ষুব্ধ। সে অবিশ্বাসী। ঈশানী ভাবতেই পারে সে তান্ত্রিকের রোষে পড়ে গেছে। কিছু একটা যদি হয়েই যায় ভেবে ঈশানী একাও বের হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া লাটুবাবুও ভাল নেই। টেপগুলো হাতাবার জন্য ঈশানীকে হুমকি দিয়েছে, ওগুলো দিয়ে দাও না হয় পরে পস্তাবে।

কে পস্তাবে ? না ঈশানী।

তার পস্তাবার কি আছে ?

নানা দুশ্চিন্তায় সুধাময়কে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। গুরুপদ গরম খিচুড়ি রেখে গেছে টেবিলে। সে টেবিলে গিয়ে বসল ঠিক তবে খেতে পারল না। নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল। ঈশানীও তো থানের উপর জুতো পায়ে ঝুম দেওয়ানা ঝুম নেচেছে। ঈশানী দেবী চামুণ্ডার কোপে পড়ে গেছে, এই অজুহাতে তাকেও সরিয়ে দিতে পারে।

সে বলল, আমি খাব না গুরুপদ। থালা তুলে নিয়ে যাও। আর শোন, আমি একটু বের হব। জরুরী কাজ আছে। ঈশানীদি এলে বলো, আমি বের হয়ে গেছি।

গুরুপদ বলল, বাবু আপনার কি মাথা খারাপ ! একা বের হবেন ! কোথায় যাবেন !

দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

তা হলে বাবু একা থাকতে পারব না। ঘরে একা থাকার মতো আমার দুঃসাহস নেই। আমিও সঙ্গে যাব।

এসেছিস। যাক বাঁচা গেল। হাত পা ধুয়ে আয়। তোর যোগ উপস্থিত। ঘাট থেকে হাত পা ধুয়ে আয়। প্রসাদটুকু মাথায় ঠেকিয়ে খেয়ে নে।

ঠাকুর পঞ্চতীর্থ মন্দিরের দরজা খুলে দিলে আকাল দেখতে পেল শুধুমাত্র একটি প্রদীপ জ্বলছে দেবীর দক্ষিণ কোণে। দুটি আসন পাতা। তামার টাট, কোষাকুষি, ফুল বেলপাতা, রক্তচন্দন, কলাপাতায় সিঁদুর এবং দুটি গেঁদাফুলের মালা দেবী চামুণ্ডার পায়ের কাছে।

কি করতে হবে আকাল কিছুই জানে না। তার সামনে রাজযোগ, ঠাকুরের ভাবসমাধি হলে এমনই দেখতে পেয়েছেন। পুণ্যাত্মা এবং গরীব সে। ঠাকুর তাকে এমনই বলেছেন। দেবী প্রসন্না তার উপর এমনও বলেছেন। লটারি পাবার মতো গোপন খবর, কাউকে সে কিছু বলেওনি। রাজযোগের অপেক্ষাতে সে ভাল করে ঘুমাতেও পারত না। লাটুবাবুর মতো তার ইমারত হবে। ময়নাকে আর ধান ভেনে খেতে হবে না। কাঙ্গাল ছুটকি বড়কি স্কুলে যাবে। বুড়ি মা তার শীতে কষ্ট পাবে না।

আকাল অন্ধকারে ঘাটে যেতে ভয় পাচ্ছিল। সে এতটা রাস্তা পার হয়ে এসেছে, শরীর অশুচি হতেই পারে—এই জঙ্গল মধ্যে ঠাকুর শিবাভোগ দিতে অমাবস্যা তিথির গভীর অন্ধকারে একা একা আসেন। ঠিক একা না, সঙ্গে হিরালাল থাকে। ঠাকুরের একমাত্র দোসর। গাজা ভাঙ খায় একটু বেশি পরিমাণেই। হিরালাল দু-তিনটে মালপোয়া খেয়ে হজম করতে পারে। সে একটা মালপোয়া খেয়ে হজম করতে পারে না। গায়ে জ্বালা উপস্থিত হয়। শরীরে শীত থাকে না। কেমন অবশ অবশ লাগে। সে নেশা ভাঙ নিজেও করে। তবে এমন সুগন্ধী নেশা ভাঙের খবর ঠাকুরের কৃপা না হলে পেত না। তন্ত্রসিদ্ধ মানুষ।

সারাজীবন এই জঙ্গলে ঠাকুর তন্ত্রসাধনা করেছেন—ঠাকুরের বয়সের যেন গাছ পাথর নাই। ঠাকুরকে জন্মেই এমন ক্ষীণকায় এবং অতি দুর্বল শরীরের মানুষ সে দেখেছে। দূর থেকেই ঠাকুরের শিবাভোগের লীলার কথা শুনেছে। মধ্যরাতে ঠাকুর এই পিচাশিতলায় অমাবস্যার অন্ধকারে শিবাভোগ মাথায় করে নিয়ে আসেন। তাঁর জরাব্যাধি নাই, মৃত্যুও নাই এমনও অনেকের বিশ্বাস।

সেই ঠাকুর এবারে কৃপাপরবশ হয়ে তার স্মরণ নিয়েছেন। এ যে কত বড় সৌভাগ্য আকালই শুধু বোঝে। তবু একা অন্ধকারে ঘাটে যেতে তার সাহস হচ্ছিল না।

ঠাকুরের বড়ই ভুল হয়ে গেছে যেন—তিনি দেবীর ঘটের উপর পড়ে থাকা একটি কোরা ধুতি এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে এটা। ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে ধুতিটা পরবি। শীত করছে?

আজ্ঞে না।

শীতে কাতর হলে চলবে না। মালপোয়া মহাপ্রসাদ খেলে শীত থাকার কথা নয়। বলে তিনি গাত্রোত্থান করে আবার কি ভাবলেন—আজ যে তিনি একাই এসেছেন, এও আকাল টের পেল। সঙ্গের দোসরটির পাত্তা নেই।

ঠাকুর দরজার বাইরে এসে কিছু পাটকাঠি ভেঙে হাতে দেবার সময় বললেন, মা তারা তারা। তারা ব্রহ্মময়ী। সবই তোমার ইচ্ছে। এই নে বলে, পাটকাঠির অর্ধেকটায় আগুন জ্বালিয়ে বললেন, এখনও দেখছি ভয় ডর তোর-আছে। ভয় ডর থাকলে তো আকাল চলবে না। তন্ত্রসিদ্ধ না হয়ে যে সেখানে যাওয়া যায় না।

তিনি এবার পাটকাঠির আগুনে পথ দেখিয়ে ঘাটের দিকে হাঁটতে থাকলেন। পেছনে আকাল, গরীব মানুষ, কথায় কথায় পরিবারের সঙ্গে বচসা, এক হাতা আগুন নিয়ে মারামারি—বউটার চোপায় অস্থির। পেট ভরে খাওয়া জোটে না। রোজ একবার করে গলায় দড়ি দিতে বলে। ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সে গলায় দড়ি দিতে পারে। তবে বুড়ি মার কথা ভেবে পারে না। বড়কি ছুটকির জন্য পারে না। তারা এত বাবা বাবা করে যে আকালের মনেই থাকে না, রাতে তার গলায় দড়ি দেবার কথা ছিল। সকাল হলেই দড়ির কথা মনে থাকে না। কোন দুঃখে লোকে গলায় দড়ি দেয় এটাও সে তখন ভেবে পায় না।

রাজযোগের কথা সে বউকেই মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল। তবে ওই পর্যন্ত। আর কোনো রা না। কবে যোগ উপস্থিত হবে, তাও সে বলেনি। বউ কাঠাখান নিয়ে ধানের ছড়া চুরি করতে গেছে, সেই ফাঁকে সেও বের হয়ে পড়েছে। বউ ফেরার আগেই ঝাঁপ খুলে, ঘরে ঢুকে কাঁথা গায়ে শুয়ে পড়তে পারবে। বউ টেরও পাবে না, ঠাকুর পঞ্চতীর্থের কাছে যোগ উপস্থিত হয়েছে বলে গেছে।

মাথায় জল ছিটিয়ে দে।

আকাল মাথায় ঘাটের জল ছিটিয়ে দিল।

তারপরই পঞ্চতীর্থ ভাবলেন, আকালের পঞ্চাঙ্গশুদ্ধির দরকার। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি দরকার। তিনি সেই মতো মন্ত্র পাঠ করে আকালের পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি করে নিলেন।

পাটকাঠির আলো ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে এলে, আর এক আঁটি পাটকাঠি জ্বেলে ফের রাস্তা দেখিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে থাকলেন। এটি একটি তীর্থক্ষেত্র, দেবীর জননেন্দ্রিয়ের অতি তুচ্ছ একটি কেশ এই মহাতীর্থে পাত হয়েছে। এমনও তাঁর ভাবসমাধিতে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তীর্থক্ষেত্রটির মহিমা বিস্তারে সফল হয়েছেন ঠিক, কুমারী রক্তবস্ত্র থেকে পাঁঠা মানত, চুল মানত সবই হচ্ছে ঠিক, তবু বড় খটকায় ভুগছেন।

কারণ দিন কাল খুবই খারাপ—ঠাকুর দেবতা প্রভাব প্রতিপত্তি হারাচ্ছে। ঠাকুর দেবতা মাথার উপর না থাকলে মানুষ যে ছাড়া গরু। যার তার বাগানে ঢুকে ঘাস পাতা খেতে পারে। বেঁচে থাকতে চোখের উপর এই অনাচার সহ্য করেন কি করে! সবই যে দেবীর কৃপায় হয় এও মানুষ বোঝে না। খাস পরিস, বেঁচে থাকিস কার কল্যাণে! সেই দেবীকে উপেক্ষা করলে তার যে সব যায়। মেলা জমে না, থানে মানত পড়ে না, শাড়ি গয়না টাকা পয়সা, অতিথিশালা থেকে ধর্মশালা তিনি একজীবনে নিজের হাতে থান মাহাত্ম্যে সব গুছিয়ে নিয়েছেন কে বোঝে!

দিনকালও হয়েছে তেমনি।

এই নিরিবিলি জায়গাটি মানুষের আত্মঘাতী হবার প্রকৃষ্ট জায়গা। আগে বছরে দুবছরে কেউ না কেউ ডালে ঝুলে থাকত। সংসারে বাস করলেই নানা অশান্তি। ক্ষুধার জ্বালা, প্রেমের জ্বালা, অবৈধ গর্ভধারণ—সবই সংসারে থাকে। আত্মঘাতীও হয়, তবে এতটা দূরে হেঁটে আসার দরকার হয় না। কীট নাশক বিষটি এখন ঘরে ঘরে—খুশি মতো খেয়ে ফেললেই চলে—এতে যে থান মাহাত্ম্যের অপযশ হয় তাও বোঝে না।

ফেরে চক্রে মেলার আগে কেউ গাছের ডালে আত্মহত্যা করলে তিনি তিথি নক্ষত্র দেখে বলে দেন, রুদ্র ভৈরবী আবির্ভাব তিথি। তিথিটি তার মস্তিষ্কপ্রসূত কে বোঝে! তিনি তো এই করে এতকাল সব চালিয়ে এসেছেন। বছরে না হোক, দু-বছরে—তাও হয় না। কেউ আত্মঘাতী না হলে কি করা! কিন্তু থান যে তার মাহাত্ম্য হারায়। দেবীর লীলা সব বলার সুযোগ থাকে না। ঠেকতে ঠেকতে পাঁচ বছরে এসে ঠেকেছে। আর পারাও যায় না। গাছে কেউ ঝুলে

পড়ছে না। গাছে ঝুলে পড়লেই খবর। দেবী বড় কাঁচাখেকো—যার যা আছে দেবীকে দিয়ে থুয়ে তুষ্ট কর। তখন ঢাক বাজে, ঢোল বাজে কাঁসি বাজে। উদ্দাম নৃত্য।

নাচ মা মেয়ে এলোকেশী—বলে যখন দিব্যভাবে তাঁর নৃত্য শুরু হয় তখন মেলা ফাঁকা করে ভক্তজনেরা হুড়মুড় করে ধেয়ে আসে। মাটিতে গড়াগড়ি যায়। যত গড়াগড়ি যায় তত ভক্তজন পরিবৃত পঞ্চতীর্থ পুলক বোধ করেন। তাকে ধরাধরি করে মঞ্চে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে হাত তুলে তার তখন উদাত্ত কণ্ঠ—এই অসীম অনন্ত আকাশের নামই অম্বর। অসম্বর স্বরূপিনী দিগম্বরী মা আমার ওই অম্বরে গা ঢাকা দিয়েছেন। পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী যাকে নিজের আবরণ করেছেন, সে যদি শূন্য হয় তবে আর পূর্ণ কে ?

শুধুই কি এই ?

এর মধ্যে আবার কত চন্দ্র সূর্য, কত গ্রহপুঞ্জ, নক্ষত্র লোক স্তরে স্তরে সুসজ্জিত। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের এই সমুজ্জ্বল প্রসারিত জ্যোতিঃপুঞ্জ এক জ্বলছে আর নিভছে। যেন সুবর্ণময় কুসুমস্তবক নীলাম্বরের উদ্দীপ্ত অঞ্চলে বায়ুবেগে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অনন্তকোটি বিশ্বের মহাবিস্তারে নিরন্তর চলে তার লীলা বিলাস।

তারপর তিনি সত্যি দেবীর ঘোরে যেন পড়ে যান। ভিতরে তার রোমাঞ্চ বোধ হয়। গায়ে কাঁটা দেয়।

কে এইসব কথা বলাচ্ছে তাঁকে দিয়ে এমন মনে হয় তাঁর। যত এমন মনে হয়, তত তিনি নিজেকে ত্রিজগৎ চরণাম্বুজের মকরন্দ মধুপানে নিত্য নিত্য অধিকারী মনে করেন। এটা তাঁর অতীন্দ্রিয় দিব্যদর্শন এমনও মনে করেন তিনি। ঘোর তান্ত্রিক, তাঁর কথা নিষ্ফল হবার নয়।

বছরে দুবছরে তাই এই রুদ্র ভৈরবী তিথি। তিথিটি নিষ্ফল হলে পৃথিবীর ঘোর বিপদ। রক্তখেকো দেবী পাঁচ বছর উপবাসে আছেন। তাকে আর তুষ্ট না করে পারা যাচ্ছে না। মেলায় তীর্থযাত্রী সমাগম কমে যাচ্ছে। থানের আয় কমে আসছে। তিথিটিকে কিছুতেই আর পিছিয়ে দিতে পারছেন না। লাটুর মেয়েটার কি দুঃসাহস ! থানের উপর জুতো পরে অবলীলায় নাচানাচি করল ! খিল খিল করে হাসল, তোমার কাঁচাখেকো দেবী কোথায় গো বলতে সাহস পায় ! কেন যে তার জিভ খসে পড়ল না। দেবী ঠিক রুষ্ট

হয়েছেন। এত অনাচার সহ্য কেউ করে।

তিনি এও জানেন মানুষের স্মৃতি বড় দুর্বল। আর্বিভাব তিথি পাঁচ বছর অন্তর না দু-বছর, এক বছরও হতে পারে—কবে কি ভাবে তিথিটি তিনি কি কারণে ঘোষণা করেছিলেন, মনে করতে পারছেন না। তবে তার কথাই সত্য, জগৎ মিথ্যা। তিনি তন্ত্রসাধক। তিনি যা বলেন ; তাই সময়, তাই প্রহর, তাই যুগ, তাই কাল।

মানুষের এই দুর্বল ব্যাধিটি সম্পর্কে সজাগ বলেই—তাঁর ইচ্ছে, এবারে ফের মেলায় তিনি অলৌকিক অতীন্দ্রিয় দিব্য দর্শনের অধিকারী হবেন।

যাইহোক মন্দিরের দরজা খুলে আকালকে বললেন, কোরা ধুতিটি এবার পরে ফেলো বাবা, অশুচি জামা কাপড় ছেড়ে ফেলো।

আকাল তার শরীর থেকে ছেঁড়া জামা এবং চাদর খুলে রাখল। কোরা ধুতিটির একটি অংশ পরল। অন্য অংশটি গায়ে জড়িয়ে রাখল। পঞ্চতীর্থ একটি আসন এগিয়ে দিয়ে বললেন, বসে পড়। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

আকালের মনে কোনো ধন্দ নেই। ঠাকুরের কৃপায় লাটুবাবুর রমরমা সে চোখের উপর দেখেছে। ভক্তরা গাড়ি করে নিমতলায় আগে আসত। এখন সড়ক পথে সোজা গাঁয়ে চলে আসে। কত সব সুন্দরী নারী পুরুষ, আর কি জেল্লা—তার বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল করে ঠাকুর দর্শনে যখন যায়, কতবার ভেবেছে, এই কি ঠাকুর, আমরা গাঁয়ের লোক তোমার, আমাদের কথা তোমার মনে থাকে না। যত কৃপাদৃষ্টি দূরের মানুষের উপর।

সেই কৃপাদৃষ্টি এবারে আকাল লাভ করছে, এটা তার খুবই ভাগ্যের কথা। তার মধ্যে কিছুটা জড়তা সৃষ্টি হচ্ছে এও সে টের পাচ্ছিল—ঠাকুর যা অনুমতি করছেন, সে তাই করে যাচ্ছে।

ঠাকুর একটি মাটির সরা এগিয়ে দিলেন। সরায় কিছু ছাই রাখা আছে।

হাতে পায়ে ভস্ম মেখে নে আকাল। চিতার ভস্ম। এতে আত্মার অহং বোধ নাশ হয়।

সে সরা থেকে কিছুটা ভস্ম তুলে নিলে ঠাকুর পঞ্চতীর্থ বললেন, কপালে।

সে কপালে মাখল।

বুকে।

সে বুকে মাখল।

উরুতে, পায়ে হাতে।

সে ঠাকুরের কথা মতো সব করে যেতে থাকল।

এবারে রক্তচন্দনের একটি পাত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন, কপালে লেপ্টে দে।

আকাল তাই করল।

তারপর তিনি কোষাকুষি থেকে জল তুলে আকালকে হাত পাততে বললেন। আকাল এক হাতের উপর আর এক হাত রেখে জল নিল। জলে তিল তুলসী কুশ হরিতকি এবং আতপ চাল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, সংকল্প পাঠ কর—

বিষ্ণুরোম তদসদস্য মীন রাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণে পক্ষে অমাবস্যা তিথৌ বৈশ্য গোত্র শ্রী আকাল দাস...দেবী চামুণ্ডা প্রীতি কাম...কালিকাপূজন কর্মনাহং করিষ্যে।

এবারে ধ্যান। চোখ বুজে মা চামুণ্ডাকে স্মরণ কর। তিনিই সৃষ্টি স্থিতি লয়ের অধিকারী। তিনিই পার্থিব, তিনিই অপার্থিব।

বল, নম করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশী চতুর্ভুজাম। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যয়ং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম।

এবারে হস্তস্থিত পুষ্প মাথায় রাখ আকাল।

সে বলল ঠাকুর আমি কিছু দেখতে পেইছিনা।

পাবি, সব পাবি দেখতে। ভয় কি, আমি তো আছি। আমি তোকে হাত ধরে নিয়ে যাব। তোর ঘোর উপস্থিত হয়েছে।

তারপর তিনি তাম্রপাত্র থেকে ফুল তুলে নিজেকে পবিত্র করে নিলেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওম গুরুভ্যো নম।

এরপর তিনি পরম গুরু, পরাপরগুরু এবং পরমেষ্ঠিগুরুর পূজা সমাপনে নিজের মধ্যে ঐশী শক্তি নিক্ষেপ করলেন।

অনন্তর চামুণ্ডাদেবীর ধ্যান—যেন এই ধ্যান শুধু তিনি নিজেই করছেন না, আকালকেও ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত করছেন—এইসব মন্ত্রপাঠে তিনি ক্রমেই একজন অতিকায় ইচ্ছেশক্তির স্বরূপ অনুভব করতে থাকলেন। মেলা প্রাঙ্গণে ভিড়। তিনি ঢুকে গেলে সবাই খুবই তটস্থ হয়ে পড়ছে। গড়াগড়ি দিচ্ছে পায়ে। ঐহিক জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা পরমগুরুর শ্রীচরণে মাথা রাখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে।

ওম চামুণ্ডা মট, হাসাং প্রকটিত দশনাং ত্রিনেত্রাং...খড়্গ শূলং কপালং নরমুখঘটিতং খেটকং ধারয়ন্তীম—প্রেতরূঢ়াং প্রমত্তাং...মনে

মনে বল আকাল।

ওঁ ঋৃং চামুণ্ডায়ৈ নম।

তিনি দেবীর পায়ে একটি ফুল নিক্ষেপ করে পরে ফুলটি করজোড়ে তুলে নিলেন। ফুলটি ছিন্ন করে এক ভাগ নিজের মাথার উপর অন্য ভাগটি আকালের মাথার উপর ছিটিয়ে দিলেন।

তারপর কৌমারীর ধ্যানে ভাবাবিষ্ট হলেন।

আতপ চাল ছিটালেন।

তারপর নানাবিধ মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক কৌমারীর অর্চনা করে অপরাজিতার পূজা শেষ করলেন।

পূজা শেষ করলেন রুদ্র ভৈরবীর মন্ত্রপাঠ করে।

ঐং হ্রীং অং সংহারায় ভৈরবায় নম। বগল বাজালেন। গালবাদ্য শুরু হল।

আকাল বলল, ঠাকুর আমি যে কিছু দেইখতে পেছি না। মাথা ঘুইরছে ঠাকুর।

সিদ্ধ সিদ্ধ। বলে হাত ধরে আকালকে তুলে নিয়ে মন্দিরের বাইরে চলে এলেন। সূচীভেদ্য অন্ধকার সামনে মাথার উপর।

পাঁচিল সংলগ্ন শিমুল গাছ থেকে বাদুড়েরা ওড়াউড়ি শুরু করে দিল। গাঁয়ের কুকুরগুলি খুব ছোটাছুটি করছে বোঝা যায়। বড় আর্তস্বরে ডাকছে। শেয়াল খটাসেরও নিস্তার নেই। তারা যেন জঙ্গল থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। মাথার উপর গাছের শাখা প্রশাখাও নড়ছে। জঙ্গলের গভীরে, মনে হল, থানের দিকে কারা হেঁটে যাচ্ছে।

পঞ্চতীর্থের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে। কার এত দুঃসাহস। কে এমন আছে এই গভীর নিশীথে পিচাশিতলায় ঘোরাঘুরি করতে সাহস পায়। মনে হল গভীর জঙ্গলে একবার টর্চের আলোও জ্বলে উঠল। তিনি ভৈরবী স্তোত্র পাঠ করছেন। সব পোকামাকড় ভস্ম হয়ে যাবে। স্তোত্রের মহিমা তবে বুঝতে পারবে। তবু তিনি সতর্ক হলেন। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে কান পেতে আছেন। পরে মনের ভুল এমন ভেবে এগিয়ে যেতে থাকলেন। সবই এত অস্পষ্ট যে ডালে মাথা লেগে গেলেও টের পাওয়ার কথা নয়।

শেয়ালেরা সমস্বরে হুক্কাহুয়া করছে।

আকাল কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মন্দির থেকে বের হবার সময় ঠাকুর তার গলায় একটা গাঁদা ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছেন, তাও সে বুঝতে পারছে। হাত ধরে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুর

অনুমান করতে পারছে না। কাপালিক সদৃশ ঠাকুরের এতই তেজ যে তার করারও কিছু ছিল না। শরীর অবশ, মাথা ঝিম ঝিম করছে। গলা শুকিয়ে গেছে। কান চোখ কিছুই আর তেমন ক্রিয়া করছে না। ঘাস পাতা, ভাঙা ডাল পায়ের নিচে—হাওয়া বইছে জোরে। ডালপালায় সড়সড় শব্দ। এই বুঝি মাথায় গাছের কোনো ডাল ভেঙে পড়ল।

ঠাকুর তার হাত ধরে রেখেছেন, তাই রক্ষা। পা দুটো তার খুবই ভারি মনে হচ্ছে।

অন্ধকারে বসিয়ে রেখে, ঠাকুর কোথায় যেন গেলেন। গাছের কোনো ডাল থেকে ঠাকুর কথা বলছেন। তারপর বোধহয় নেমে এলেন—সে সব বুঝতে পারছে। আবার ডালে কেন উঠে গেলেন সে বুঝল না। তাকে ঠেলে অন্য একটি ডালে তুলে দিচ্ছেন।

সে পারছে না। ডাল ভর করে সহজেই মাটি থেকে উপরে ওঠা যায়। সে ডালে ভর করে দাঁড়ালে, ঠাকুর তাকে ঠেলে উপরে তুলে দিলেন। নিজেও উঠে এলেন। কারণ তিনি তাকে ধরে রেখেছেন নিচে সে পড়ে না যায়।

সামনে আর একটা ডাল আছে। পা বাড়া।

সে পা বাড়াতে গিয়ে হড়কে পড়ে যাচ্ছিল, ঠাকুর তাকে ধরে ফেললেন।

আবার পা বাড়া।

সে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে বুঝতে পারছে।

॥ দশ ॥

ধান পোকামাকড়ে খায়, ইঁদুরে বাদুড়ে খায়। সব থেকে ফসলের আত্মরক্ষা হলে মহাজনদের ঘরে ঘরে নবান্ন। ধান উঠলে ভোজ—গরীব মানুষজনের দু-এক বেলা পেট পুরে খাওয়া—আর কত রকমের পার্বণ শুরু হয়ে যায় গেরস্থের ঘরে ঘরে।

ছোটবংশী তরাসে ডেরা থেকে বের হতে পারছে না। দূরে পিচাশিতলায় কেউ হেঁটে যাচ্ছে। আত্মনাশ। ঝুলে থাকবে। রাতের আগের দিকে হলে, হয়ে গেছে, রাত শেষের দিকে হলে, হয়নি এখনও। সে বার বার মাটি থাবড়াচ্ছে আর মাথা ঠুকছে।

সাহসে কুলায় না। সড়কিখানা টেনে ঝিম মেরে বসে থাকে। কোথাও যেন জমিতে খস খস শব্দ। সে কানখাড়া করে রাখল।

শালা ইঁদুরেরই কম্ম। ডংকা বাজালেও ভয় পায় না। বংশী

দেখল কুয়াশার মতো ঘন অন্ধকার যেন কিছুটা ফিকে হয়ে আসছে। পাশে সড়ক পার হলে পীর বাবার দরগা। সেখানে তল্লাটের কবরখানা। মৃত আত্মার বাসভূমি। জিন পরি অন্ধকারের কুহকে পড়ে ভেসে বেড়াতেই পারে। এই তরাসে আজও সে ডেরার ডেঁড়ি কুপি নেভায়নি।

খসখস শব্দ কেমন দ্রুততর হচ্ছে। টর্চ জ্বেলে দেখতে পারে। আজ তারও উপায় নেই। এই তিথিতে ঘরেরই বার হয় না কেউ। দরজা জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকে সবাই। ঘরের আলো বাইরে পড়লেও অমঙ্গল হয় গেরস্থের। সে যে কি করে!

কোনদিকটায় খস খস শব্দ হচ্ছে ফের কান খাড়া করে বংশী শোনে। আর তখনই আকালের বউটার কথা মনে পড়ে গেল। তুষের গোলা আছে একটা। গোলায় কি রাখে কে জানে। ধানের ছড়া রোদে দিয়ে শুকায়। কার ধান, কার ছড়া, কেই বা দেয় ধান সে বোঝে না।

তারপরই তার কেন যেন মনে হয়, ইঁদুর বাদুড় না। মনুষ্যজগতের স্ত্রীধন। মূল্যবান বড়। তার উপর সংশয় ঠিক না। ইঁদুরে আর মানুষে বড় ফারাক।

আর ময়না এত দূরেই বা আসবে কেন! আমবাগান পার হলেই অভয়পদর জমি। দু একটা ছড়া ইচ্ছে করলে সে জমি থেকে সহজেই তুলে নিতে পারে। এত দূরে আসবে কেন? জমির পর জমি। একটাও লাটুবাবুর নয়। বলাই কেরাণী না হয় অভয় মাস্টারের। কিছুটা দাশু করের। ময়না লাটুবাবুর লাটে বাস করে ঠিক, তবে লাটুবাবুর জমিজিরাতে ঢুকতে হলে অনেকটা রাস্তা হাঁটতে হয়। দিনেরবেলাতেও অগম্য, দশজনা দশদিকে, জমিতে জমিতে মানুষের মাথা ভেসে থাকে, কেউ আগাছা সাফ করছে, কেউ ঘাস কাটছে, তা জমির আলে মানুষের ছানাপোনা যে ঘুরে বেড়ায় না তা নয়, একখান শামুকের খোল হাতে থাকতেই পারে, তাই বলে যুবতী ময়না মাঠের মধ্যে কাঁখে কাঠা নিয়ে আসে কি করে! ধানের ছড়ায় যতই লুকোছাপা থাক চোর সাব্যস্ত হবে না! ধানের ছড়া কি তবে ময়না কাঙ্গালকে দিয়ে সরায়!

এবারে কি তার রোষ পড়েছে লাটুবাবুর জমিতে। ছোটবংশী তুরে দাদা দাদা করি, তু একবার আমার কষ্ট বুঝলি না—পাপ হবে, কত পাপ হয় দ্যাখ। জমি তর খালি করে না দিচ্ছি ত আমি অন্নদার বেটি লয়। পাপের আদিখ্যাতা পুড়ি।

রাত দশটা বাজলেই জাগালদারদের হাঁকাড় শোনা যায়। হাঁসখালির থানায় ঘণ্টি পড়ে আর হাঁকাড় ওঠে। সারা মাঠে জাগালদাররা জেইগে আছে, তুমি চোর হও, বাটপাড় হও রক্ষা নাই। রাত বারোটা বাজলে আবার হাঁকাড়। এই হাঁকাড় শেষে যে যার ডেরায় ঢুকে যায়। কারণ গাঁয়ের মহাজনরা এত রাতে আর জেগে থাকে না।

হাতে সড়কি নিয়ে নিজেই ভূতের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে জমিতে। কুয়াশা আবার ঘন হয়ে উঠছে—সে বুঝছে তার নিস্তার নাই। ডেঁড়িকুপিতে মাতাল পাবে না। অদৃশ্য এক শত্রু পায়ে পায়ে নেমে আসতেই পারে। অদৃশ্য এক শত্রু তার ভিটেমাটি উচ্ছেদ করার তালে আছে। লাটুবাবুর বাড়ির অন্ন না তুলে ছাড়বে না। চোর ছ্যাঁচোর আখ্যা দিয়ে লাটুবাবু তারে বিদায় করে দেবে। অদৃশ্য শত্রু এতদিনের সুখ্যাতি লোপাট করার তালে আছে।

সে ফের কেমন পাগলের মতো সড়কি বাতাস ফুঁড়ে ছুঁড়ে দিল। যেখানে খস খস শব্দ শুনতে পাচ্ছে সেখানেই তার সড়কি গেঁথে গেল। কিন্তু হায় সড়কি তুলে দেখছে কিছু নেই—না ইঁদুর বাদুড় না কোনো পোকামাকড়। শুধু কিছু আগাছা আর মাটি লেপ্টে থাকছে সড়কির ফলায়। সাফ সোফ করে জমির মধ্যে ফের আবার ঘাপটি মেরে বসে থাকছে।

কোনদিকে কে ধায়, সে কেমন বেহুঁশ, তার শরীর টাল মেরে যাচ্ছে। মরা কাঠের মত অসাড় শরীর। কিন্তু সে আজ মরিয়া। —কোন হারামির কাজ এটা—তার অদৃশ্য শত্রু আবিষ্কার না করা পর্যন্ত নিস্তার নাই। ঠাণ্ডায় মরে পড়ে থাকলেও আজ তার শেষ মোকাবেলা। কর্তার সন্দ দূর করতে না পারলে সে পৃথিবীর একজন বেইমান মানুষ।

দূরে থানার পেটা ঘণ্টার শব্দ।

একটা বাজে।

কে খায়?

ইঁদুরে বাদুড়ে খায়।

কে খায়?

পোকামাকড়ে খায়।

পোকামাকড়ে খায়, মনুষ্যের অপোগণ্ড খাবে না!

সে ভাবল খেতেই পারে।

কিন্তু তার তো দেখা মিলছে না। অন্ধকারে কিছু ছায়ার মতো

ভেসেও যাচ্ছে না।

হাতের সড়কি হাতেই আছে। সে আজ পর্যন্ত একটা পতঙ্গ খুন করতে পারেনি। সে এধার ওধার শুধু ভিজা মাটিতে সড়কির খোঁচা মারে। খোঁচা মারাই সার।

ভিতরের দিকের দু-বিঘা জমির ধান বলতে সাফ। শুধু কাঠি আর কাঠি। পোকামাকড়ের উপদ্রবে কর্তার মাথা খারাপ। ক্রোধ বড় বিষম বস্তু। ঈশানীদি বাবুর ক্রোধে ক্যানে যে হাওয়া দেয়! বাপের এত অবাধ্য কেন তাও বোঝে না। কর্তার সন্ত্রাসে গাছপালা পর্যন্ত হেঁট হয়ে থাকে। পার্টির দয়ায়, যার খুশি মাথা কাটছে, আগুন দিচ্ছে, পুড়িয়ে মারছে, সুযোগ পেলে ঘরের মধ্যেই মীরাদিরে ধর্ষণ করছে, তারে তুমি কন্যে হয়ে ডরাও না! কর্তার ক্রোধ সাংঘাতিক—বেম্মতালু জ্বইলে গেলেও মুখ খারাপ করবে না। শুধু সকালে উঠে মুঠোর ফাঁকে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলা, বুইজলে বংশী—আবাদ দেখছি সাফ হয়ে গেল।

সে হাত জোড় করে থাকে।

দিনকাল বড় খারাপ বংশী। শত্রুর চোখ টাটায়। জমি তো না, যম। যম নিয়ে কার আর কারবার করবার বাসনা থাকে! সব বেচে দেব। গোরু মোষ সব। তর আর কি দরকার আছে বুঝি না।

কর্তার ভারি ঠাণ্ডা মাথায় কথাবার্তা। ঠাণ্ডা মাথায় কলজের মধ্যে হড়কা বান ছুঁইড়ে মারে। বড় ওস্তাদ লোক। বড় ঝাকসু আছে।

সে হাই করে ফের জমির মধ্যে সড়কি ছুঁড়ে মারে।

শালোর ব্যাটা, ইঁদুরের এত তেজ! তুই আমারে হা-অন্ন কইরে ছাড়বি। তোর এত দুষমণি! মাথা টালমাটাল। আমারে পক্ষী বানায়ে উড়ায়ে দিতে চাস।

আর তখনই দেখল অদূরে আবছা মত কে ভেইসে উঠছে।

দেখা যায় না। কুয়াশার অন্ধকারে ভেইসে যাচ্ছে।

সে হাঁকল, কে? কে তুমি?

জবাব নাই।

আরে কও তুমি কি সেই মাঠের দেবী।

কোনো জবাব নাই।

এ শালো ভারি মরণ। সেই আবছা অন্ধকার কেমন খিল খিল করে হাসে।

ছোটবংশীর বুক কাঁপে।

তুমি জিন পরি? কও কথা কও।

আবার খিল খিল চতুর হাসি।

ছোটবংশী নড়তে পারছে না। জমিতে পা গেঁথে যাচ্ছে। আর সেই দেবী তখন অবলীলায় তার সামনের দু-বিঘা জমিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কাঁখে যেন কি একটা ঝুলছে।

সে হাঁকল, তুমি দেবী হও, যক্ষ রক্ষ হও কিছু মানি না। আমার অন্ন বলে কথা। আমি পাপের ভাগি হই, আমার ইহকাল পরকাল জাহান্নমে যাক, তবু আমি ছোটবংশী—লাটুবাবুর আস্থাভাজন মানুষ।

সে বলল সড়কির খোঁচায় এফোঁড়-ওফোঁড় হলে আমার দোষ নাই। জয় মা মাঠের দেবী, তুই ভরসা। দেবী হলে তুর গায়ে স্পর্শ করবে না। আর মানবী হলে তুই রক্তে ভেসে যাবি।

আর তখনই আবার খিল খিল হাসি।

তুই কে রে? তু কে বল। বলেই ছোটবংশী সেদিকটায় ছুটে গেল। আর কাছে গিয়ে দেখল, অদৃশ্য। কেউ নেই। কোমর সমান ধানগাছ। বসে পড়লে সাধ্য কি এই নিশুতি রাতে খুঁজে বার করে।

সে বলল, তু কি ময়না? জবাব দে।

ধানগাছের অদৃশ্য আড়ালে সেই কণ্ঠ—আমি ইখানে।

তু কোনখানে জানতে চাই না। উঠে দাঁড়া। দেখি।

না। আমি কি কারো গোলাম! তোর কথায় উঠে দাঁড়াব।

বুলছি উঠে দাঁড়া। সড়কি ছুঁড়ে মারছি। দ্যাখ মজা।

বুলছি উঠে দাঁড়াব না। কাছে আয়, খুঁজে দ্যাখ আমি কুথি আছি।

বলে কি?

ছোটবংশীর মনে হয় ময়না কি সেই বালিকা আছে! সেই গম খেতে ময়না কি উলঙ্গ হয়ে বসে আছে ভাবছে। ভাবতে গিয়ে শীতটা কেমন তার আরও চেপে বসল। বলল, তুর মরণ হবে বুলছি।

হউক। মরণ আমার হউক।

তুর এত সাহস। বুলতে তুর লজ্জা হয় না।

না হয় না। তুই বংশী চামার।

চামার, আমি চামার!

চামার না হলে দু-ছড়া ধান নিলে তুর বাবুর অনিষ্ট হয়। তুর অনিষ্ট হয়!

জমি ফাঁক তাই বলে।

তা দু একখানা গাছ কাঠি হলে জমি ফাঁক হয়?

তুর হয় না। লাটুবাবুর হয়। তুর জমি সরেস ময়না—তু কোথায়

বসে কথা বলছিস বুঝছি না। আমার মাথা খারাব কইরে দিস না। ভাগ বুলছি।

ভাগব ক্যানে ? ক্ষমতা থাকে ভাগাও।

নিশীথের কোন অদৃশ্য আড়াল থেকে ময়না কথা বলছে সে বুঝতে পারছে না।

তু কুথি ? কুথি ঘাপটি মেইরে বইসে আছিস ? তন্ন তন্ন করে খোঁজে ছোটবংশী। আঁধারে আশ্চর্য লীলা খেলার মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে ময়না বুঝতে পারছে না। ময়নাকে খুঁজে বেড়ায় আঁধারে। ধানগাছের পাতা লেগে কুট কুট করছে শরীর।

বংশী তাকে খুঁজতে কিছুটা এগিয়ে গেলেই সে উঠে দাঁড়ায়। শামুকের খোলে কট করে ধানের ছড়া কাটে। যেন এ-তার বাপের জমি, সোয়ামির জমি।

বংশী দৌড়ে কাছে যেতেই আবার ডুব।

যেদিকটায় ধানগাছের আড়ালে ডুবে গেল বংশী সেদিক পানে ছুটছে। আর আশ্চর্য গিয়ে দেখে, নেই। ধানগাছ সরিয়ে হাত দেয়—নেই। চারপাশের ধানগাছ সরিয়ে খোঁজে—নেই। সে ভয়ে তারপর কেন যে আতঙ্কে হেঁকে ওঠে—তুমি কে ? সত্যি করে বল তুমি কে ? তুমি কি মাঠের দেবী, না তুমি আমার অন্তরঙ্গ নারী। ময়নার রূপ ধরে কি তুমি আমারে ছলনা করছ ! এ-ভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে কোন নারী !

আবার দেখল, কিছু দূরেই সেই নারী অন্ধকারে ভেইসে যাচ্ছে। ছায়া হয়ে নড়াচড়া করছে। কোনো আর কথা বলছে না। ময়নার গলার স্বরে এতক্ষণ যে কথা বলছিল, তাও আর নেই। চরম নৈঃশব্দ। এবার সে অধীর হয়ে বলল, তুমি মাঠের দেবী হও পরি হুরি যাই হও—রক্ষা নাই। সড়কির খোঁচা খেতে না চাও, থাম।

আবার খিল খিল হাসি। ঠিক ময়নার মত হেসে গড়িয়ে পড়ছে। ময়নার মত কথা বলছে—ও বংশী তোমার সড়কিতে ধার নাইগ। সড়কির ডর দেখাবা না। ভোঁতা সড়কির বড়াই আর কতকাল করবে। বলে, দেবী তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

দেখি সড়কিখান, হাত দিয়ে দেখি। কি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, দেখাও।

এ-যে সত্যি ময়না ! সে বিশ্বাস করতে পারে না। মাঠের দেবীর ছলনা কি না কে বলবে।

সে বলল, দেবী আপনি আমারে রক্ষা করেন। আপনি আমার

অন্ন তুলবেন না।

আকালের বউর সে কি হাসি। কোমর বাঁকিয়ে খিল খিল করে হাসছে। তারপরই চোখ কটমট করে বলল, তু বংশী আমারে দেবী বলিস ক্যানে! আমি ময়না, বিশ্বাস না হয়, হাত দিয়ে দ্যাখ।

দেবী কোপে ফেলবেন না।

বুলছি আমারে হাত দিয়ে দ্যাখ।

আমারে কোপে ফেলবেন না।

ধুস তুর কোপ। বলেই কাঠাখান ছুঁড়ে দিয়ে ছোটবংশীকে ময়না পাগলের মতো সাপটে ধরল।

ও মাঠান, এটা কী করে লিছেন। আমারে ছলনায় ফেইলে দেবেন না মাঠান।

বংশী ময়নাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে মোষের মতো আকাঁড়া অন্ধকারে ছুটতে থাকে। দেবীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডেরার দিকে ছুটছে। ময়না দাশু করের লাট পার হয়ে এতদূরে ভৈরবী তিথিতে একা আসতেই পারে না। পুরুষ মানুষ হলে কথা ছিল, আকাল হলে কথা ছিল, এমন কি কাঙ্গাল হলেও কথা ছিল—কিন্তু ময়না! সে কি করে হবে! তার ভয় ডর থাকার কথা। ইজ্জত থাকার কথা! এমন আঁধার রেইতে কোন নারী পুরুষের মামলা সামলাতে পারে।

আসলে সে ময়নার কথাই ভাবছিল। তাই দেবী ময়নার রূপে ছলনা করছেন। আকাঁড়া অন্ধকারে কিছু বোঝাও যায় না—শুধু গলার স্বরে সে টের পায় সব।

ডেরায় ডেঁড়িকুপির আলোতে ময়না হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। বলল, আরে বংশী তু মানুষ না অপদেবতা?

বংশী কেমন ফাঁপড়ে পড়ে গেল। এই আকাঁড়া আধাঁর রেইতে কোন নারীর ক্ষেমতা আছে মাঠে আসে। পিরিত না থাকলে সম্ভব না। কিন্তু সে যে লাটুবাবুর আস্থাভাজন লোক। সে এ কাম করলে দুনিয়া যে রসাতলে যাবে। বংশী ঘাবড়ে গিয়ে সরে বসল। বলল, ভাগ, শিগগির ভাগ। কে কুথি দেখে ফেলবে। তু ডেরা থেকে ভাগ।

না। বলে বংশীর শরীর টেনে ওম নিতে চাইলে বংশী উঠে দাঁড়াল। ডেরার বাইরে বের হয়ে বংশী তড়পাচ্ছে, বের হয়ে আয় বলছি।

বের হব না। আমার ঘুম পাচ্ছে বংশী। কাঁথাখান শরীরে জড়িয়ে

দেবার সময় বলে, বেশ কেঁথাখান। পাটকাঠির ওম—ওমা সুরদাসী পালার অন্নপূর্ণার ছবি তোমার ডেরায় বংশী। কী সুন্দর। আমারে এইনে একখান দেবে।

সারা মাঠে সেই আকাঁড়া অন্ধকার। দেবী তার ডেরায় ধরা দিছেন। সে যে কি করে? তার পাপ পুণ্য বোধ প্রবল। পরস্ত্রী হলগে জননী। পরের দ্রব্য না বলে লিলে চুরি। ময়না লিতে পারে। সে পারে না। ইহকাল একভাবে গেল,পরকাল নিয়ে তার ভাবনা—ময়নার জন্য সে তার পরকাল নষ্ট করতে পারে না। সে বলল, যা যত খুশি জমি থেকে ছড়া কেটে লে, ডেরা থেকে বের হ্।

অরে বংশী আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। কেঁথাখান ঢাকা দিয়ে শুলাম। কেঁথার ভিতর ঢুকে যা বংশী। ওম পাবি।

বংশীর চক্ষু চড়কগাছ। শালো হারামজাদি বলে কি! তার ডেরায় রাত কাটাবে বুলছে। বংশীর এখন নিজেরই চুল ছিড়তে ইচ্ছে করছে। কেন যে ময়নার পিছু নিল!

দোহাই ময়না, বের হয়ে আয়।

তু বল, একখানা অন্নপূর্ণার ছবি দিবি।

যা। দিব। না হয় বাতা থেকে ছবিখানা তুইলে লিয়ে যা।

যাব?

বুলছিত লিয়ে যেতে। সব লিয়ে যা—যা খুশি। শুধু আমার ইজ্জত লিস না।

যাব না। আমার পাশে এসে শুয়ে থাক। বংশী কেমন বিপদে পড়ে গিয়ে পাশে বসে বলল, কী করতে হবে বল।

কিছু বোঝ না! তু একটা ম্যাড়া। আমারে কি করতে হবে বোঝ না। মেয়েমানুষরে কি কইরতে হয় জান না।

কি কইরতে হবে?

মেয়েমানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছে বোঝ না!

বংশী বুঝবে কি করে! সে তো জানেই না পরস্ত্রীকে কি-ভাবে পেড়ে ফেলতে হয়। সে জানেই না পরস্ত্রীর সঙ্গে কি করে আটক হতে হয়। বংশীর চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠছে। শরীর গরম হয়ে উঠছে। শীতের কুয়াশার মতো শরীর থেকে ক্রমে কি সব নেমে আসছে। সে অসাড় বোধ করছে। কেমন এক অপার্থিব জগতের কথা বলছে ময়না। সে ভ্যাবলু বনে গেছে। বড় বড় চোখে দেখছে ময়নাকে। অথচ হাত দিতে পারছে না।

ও বংশী!

হুঁ।

কি হলগে তোমার ?

বুঝতে লারছি।

ময়না ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছে। মোষের মত মানুষটাকে কিছুতেই উত্তপ্ত করতে পারছে না। জায়গা মত হাত দিয়ে বুঝল একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে। কুঁকড়ে আছে সব। যেন সেই বরফ, কিংবা পাথর, জড় পদার্থ যারে কয়—এই হলগে বংশী, লাটুবাবুরা বংশীদের এই করে তোলে। ময়না সহসা এতটা ক্ষেপে গেল যে সে তার শাড়ি খুলে সব দেখাল, তারপর শাড়ি পরে বংশীর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিয়ে বলল, তুমি সত্যি ম্যাড়া বংশী। তুমি পাথর। তুমি নিজেই নষ্ট হয়ে গেছ। তোমার জমিন থেকে দুটো ছড়া নিলে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়। বান্দা থাকলে বুঝি মানুষ নষ্ট হয় না! ময়না তারপর তার কাঠা শামুক বংশীর মুখে ছুঁড়ে দিয়ে ছুটছে। সে কেমন খ্যাপা রমণী—শরীরে তার গরম। সে দৌড়ে মাঠ পার হয়ে গেল।

আর সেই শস্যক্ষেত্রে বংশী নির্বাক। আকাশে তারারা ছোটাছুটি করছে। কোনটা কার উঠোনে নেমে যাবে সে জানে না। এইমাত্র একটা তারা যেন খসে পড়ল আকালের বাড়িতে। সে বলল, ভগবান, ময়নার গরম ধরে গেছে। গরমে সব হয় ভগবান। কেউ লাটুবাবু হয়, কেউ পঞ্চতীর্থ হয়। আবার আকালও হয়। সব গরমের বশ। তবে কেউ খায়, কেউ খায় না কেন ভগবান। কেউ লাট, কেউ গোলাম বনে থাকে কেন ভগবান!

তখন ময়না ছুটছে। সে জানে আকাল বারান্দায় বসে আছে ঠিক—চাদরের তলায় আলসে নিয়ে বসে আছে। এক হ্যাচকায় গায়ের চাদর খুলে পরনের গামছা খুলে তার জমে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। সে ছুটছে।

আর উঠোনে ঢুকে দেখল, বারান্দায় আকাল নেই। ঘরে নেই। গেল কোথায় মানুষটা! ভৈরবী তিথিতে কেউ দরজাও খুলবে না। ডাকলে সাড়া দেবে না। আজ যে সেই তিথি এতক্ষণে মাথায় ঢুকতেই আতঙ্কে তার বুক হিম হয়ে গেল।

বুড়ি শাউড়িকে বলল, গেল কুথি মানুষটা।

বুড়ি শাউড়ির এক কথা, বড় টাল। আর কিছু বলল না।

সে ঘরে ঢুকে বলল, কাঙ্গাল উঠ বাবা। তোর বাপ বাড়ি নেই। তোদের কিছু বলে গেছে। না। অ মা চামুণ্ডা আমার কি হবে! কোথায় গেল! এই বুঝি খবর এল দ্বাদশ বৃক্ষে মানুষটা ঝুলছে!

সঙ্গে সঙ্গে বিলাপ শুরু হয়ে গেল।

আমার সর্বনাশরে বাপ!

আমার গরমে তুর বাপ গেলরে কাঙ্গাল! আমি জানি কোথায় গেছেরে বাপ। গাছে ঝুলছেরে বাপ। এ মা চামুণ্ডা তুমি আমার এ কি সর্বনাশ করলেগ। অর কুনো পাপ নাই মা, তবে অরে কেন ডেকে লিলেগ।

উঠোনে তখন টর্চের ফোকাস।

ইশানী দির গলা।

কি হচ্ছে ময়নাদি। রাতে মরাকান্না জুড়ে দিয়েছ। থামো।

তোমার দাদা কুথি চলে গেছে কাউকে কিছু না বলে।

যায়নি কোথাও। নেশা ভাঙ খেয়ে জঙ্গলে পড়েছিল। গুরুপদ তুলে এনেছে।

গুরুপদ আর সুধাময় আকালকে বারান্দায় বসিয়ে দিল।

সুধাময় বলল, তেঁতুল আছে ঘরে?

আছে ডাক্তারবাবু।

গুলে খাওয়াও। ঘরে নিয়ে নাও। কাঁথা কাপড়ে ঢেকে দাও। কিচ্ছু হয়নি। ভাল হয়ে যাবে। চিন্তা করো না। তারপর গুরুপদকে বলল, পঞ্চতীর্থের বাড়িতে খবরটা দিয়ে দিও। তিনি ডাল থেকে পড়ে গেছেন। হাত পা ভেঙে পড়ে আছেন পিচাশিতলায়। তাঁকে যেন তুলে নিয়ে আসে।

ঈশানী কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি যাও। আমি ঠিক উঠে যাব।

ওঠো না দেখি। শাড়ি পরে আছ। অন্ধকারেও তুমি কত সুন্দর।

মারব বলছি।

আরে অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না।

এই কি হচ্ছে!

তারপরই মনে হল কে আবার না জেগে যায়। সে তাড়াতাড়ি গাছটাকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে ভিতরে ঢুকে গেল।

সুধাময় তারপরও গাছের নিচে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তার কেন জানি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। পুব আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে।

সে একা একা হাঁটছে। জীবন এত সুন্দর হয়, জীবনে এত মাধুর্য থাকে ঈশানীর সঙ্গে না মিশলে সে বুঝতে পারত না। ঈশানী গাছে ওঠার আগে কার উদ্দেশে যে প্রণিপাত করল তাও সে জানে না।

এই নৈঃশব্দ প্রেম এবং ভালবাসা মানুষের বড় দরকার।

কেন যে আজ মনে হল তার, ভালবাসলে সব অসুখ শুধু সেরে যায় না, ভালবাসলে লজ্জাও হয়। ভালবাসলে মাথার উপর একজন ভগবানও থাকে।